বিষয় কার্টুন

চলতি সময়ের কার্টুন সম্পর্কিত একমাত্র পত্রিকা

সংখ্যা ১ ।। ২য় বর্ষ ।। ১৪১৪

১২৫ বর্ষে যতীন্দ্রকুমার সেন

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - প্রিয়ব্রত রায়
স্ক্যান এবং এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনার কাছে যদি কোন পুরনো ম্যাগাজিন এর কপি থাকে
এবং আপনি তা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের পাঠাতে চান স্ক্যান করার জন্য
তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

বিষয় কার্টুন

চলতি সময়ের কার্টুন সম্পর্কিত একমাত্র পত্রিকা

সংখ্যা ২ ।। প্রথম বর্ষ ।। আশ্বিন ১৪১৪

সম্পাদনা

বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলী

সৌমেন পাল • ঋতুপর্ণ বসু • সুগত রায়

পত্রিকা দপ্তর ঃ ১৮/২২, ফার্ণ রোড, কোলকাতা ৭০০০১৯

☎ দূরভাষ ঃ২৪৬১০৯২৯, ৯৪৩৩৮৮৭৮৮৯, ২৪০৬১৮৮০

ঃ উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

রেবতীভূষণ ঘোষ

অমল চক্রবর্তী

পরিমল রায়

দেবাশীষ দেব

ঃ প্রকাশন সহযোগিতা ঃ

প্রদীপ পারেখ

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌতম কুমার দে

দেবাশীস সেন

প্রচ্ছদের ছবি ঃ যতীন্দ্রকুমার সেন

প্রচ্ছদের নামলিপি ঃ শৈল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ নির্মাণ ঃ সৌমেন পাল

ঃ অক্ষরবিন্যাস ঃ

মুকুট লেজার, ১২৩এ/১ডি, সাউথ সিঁথি রোড,

কোলকাতা - ৭০০০৩০, দূরভাষ ৯২৩০৫৫২৫৮৩

ঃ মুদ্রণ ঃ

রাজু জেরক্স, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০০০১

ঃ প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ

দি স্পেকট্রাম, নিউ পার্ক, কসবা,

কোলকাতা ৭০০০৮৪

ঃ বিনিময় ঃ

৪০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

• প্রস্তুতি প্রসঙ্গ		৫
• ১২৫ বর্ষে যতীন্দ্রকুমার সেন	...	৭
• যতীন্দ্রকুমারের চিত্রকলা	শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা	১৫
• স্মৃতিকথায় যতীন্দ্রকুমার সেন	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮
• চোদ্দ নম্বর ও যতীন্দ্রকুমার সেন	গোপাল হালদার	২১
• একটি স্মরণীয় দিন	পরিমল গোস্বামী	২৫
• যতীন্দ্রকুমার সেন	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩০
• সরসচিত্রে যতীন্দ্রকুমার সেন	কুমারেশ ঘোষ	৩২
• একটি কথোপকথন	সাক্ষাৎকার: দীপংকর বসু	৩৫
• বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন, রাজশেখর বসু ও যতীন্দ্রকুমার সেন	ঋতুপর্ণ বসু	৪৫
• ১৪ নং পার্শীবাগানের আড্ডা, দুই সেন মহাশয় ও একটি কার্টুন	সংকলন: বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়	৫১

যতীন্দ্রকুমার সেনের রচনা

• কলাকুশলী পরশুরাম	৫৪
• প্যাক্ট	৫৭
• ল্যাজ ও ল্যাজুড়	৬১
• যতীন্দ্রকুমার সেনের অলংকরণ ও কার্টুন	৬৯

অড়চোখে (নিয়মিত কার্টুন বিভাগ) :	ঋতুপর্ণ বসু ও অভীক বসু	৮৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

• দীপংকর বসু
• অশোক কুমার রায়
• ডঃ গৌতম ভদ্র
• প্রদীপ পারেখ
• অমিতানন্দ দাশ
• অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
• বারিদবরণ দাস
• 'দেশ' পত্রিকা
• আনন্দ পাবলিশার্স
• মালদহ জেলা গ্রন্থাগার
• 'রবিবাসর' বার্ষিক পত্রিকা

'আড়চোখে' বিভাগের কার্টুনগুলি ছাড়া এই সংখ্যায় লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত সমস্ত স্কেচ ও কার্টুন যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত

• লেখা সংশোধন
মিঠু কর্মকার

• প্রচ্ছদ মুদ্রণ
'দি স্পেকট্রাম'
১. নিউ পার্ক, কসবা, কলকাতা

• বই বাঁধাই
গোলাম মোস্তাফা
ওয়েস্টন স্ট্রীট, কলকাতা

রচনা, চিত্র ও তথ্য সংগ্রহ

• দীপংকর বসু • অশোক কুমার রায় • সৌমেন পাল • সুগত রায়

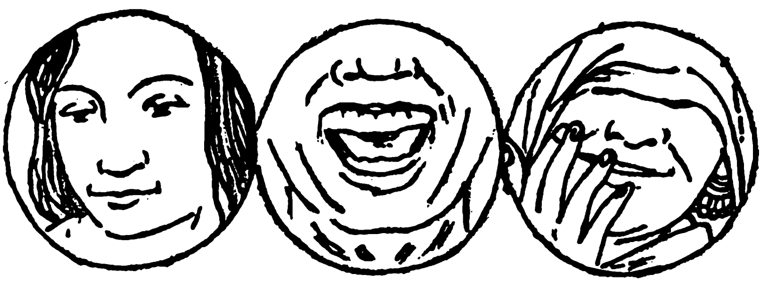

:প্রস্তুতি প্রসঙ্গ:

বিষয় কার্টুন...এবার দ্বিতীয় সংখ্যা...অনেকটা বিলম্বেই। ইতিমধ্যে পয়লা সংখ্যা... 'কুড়ি সংখ্যা' দেখে যাদের ভালো লেগেছে বা যাঁরা আগ্রহ বোধ করেছেন, তাঁদের অনেকেই খোঁজ নিয়েছেন পরের সংখ্যা বেরোলো কি না...বেরোয় নি শুনে হতাশ হয়েছেন। তাঁদের আগ্রহ, ভালোলাগা, প্রত্যাশা আমাদের উৎসাহ বর্ধন করেছে। তবে শুধু উৎসাহ থাকলেই হয় না, চাই নানান প্রয়াস।

যাইহোক আমাদের পরবর্তী প্রয়াসের ফল '১২৫ বর্ষে যতীন্দ্রকুমার সেন'; যাঁর আর এক পরিচিতি 'নারদ' নামে। বাংলার রসসাহিত্যে দুর্লভ জুড়ি পরশুরাম (রাজশেখর বসু) ও নারদ (যতীন্দ্রকুমার)। একজন লিখেছেন অপরজন তাঁর লেখা চিত্রায়িত করেছেন। ব্যঙ্গের কুঠার হস্তে বাংলাসাহিত্যে পরশুরামের আগমন, তাঁর সৃষ্ট ব্যঙ্গচরিত্রগুলির কায়িকদর্শন নারদের তুলিতে। আশ্চর্যের কথা শুধু পরশুরামের লেখার সচিত্রকার রূপেই তাঁর নাম বিখ্যাত অথচ যতীন্দ্রকুমার ছিলেন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী। তাঁর কলম থেকেও যে কিঞ্চিৎ রচনার নিদর্শন বেরিয়েছে তাও অকিঞ্চিৎকর নয়। বস্তুত রঙ্গচিত্র তিনি শুধু তুলিতে নয় কলমেও এঁকেছেন, তার নিদর্শন পাঠকেরা এই সংখ্যায় পাবেন। নিজের রঙ্গসাহিত্যের চিত্রায়ণ তাঁর নিজেরই। লিখেছেন শিল্পবিষয়ক নিবন্ধ ও সমালোচনাও। কয়েক বছর আগে তাঁর কিছু রচনা নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, এই সংখ্যায় সেই সংকলিত রচনাগুলি বাদ দিয়ে অন্যান্য লেখাগুলি দেওয়ার প্রয়াস হয়েছে। এর ফলে সংগ্রাহক ও উৎসাহী পাঠকেরা উপকৃত হবেন। কৃতি এই মানুষটির জন্মশতবর্ষ নীরবে অতি ক্রান্ত হয়ে আরো ২৫ বছর সময়ের সরণী থেকে মুছে গিয়েছে। এই সংগ্রহে তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি পূর্বপ্রকাশিত লেখা সংকলিত, তা ছাড়া রাজশেখরের দৌহিত্রীতনয়, দীপংকর বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়েছে মূলতঃ যতীন্দ্রকুমারকে কেন্দ্র করেই। এ সংখ্যায় ভারতের বিজ্ঞাপন জগতের অগ্রপথিক যতীন্দ্রকুমারের মূল্যায়ণের প্রয়াস রয়েছে লেখা ও ছবির মাধ্যমে। তার জন্য যে সব দুর্লভ লেখা ও ছবির সমাবেশ ঘটেছে তা সম্ভব হয়েছে আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী ও শুভানুধ্যায়ীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে। সেই সঙ্গে যাঁরা মুদ্রণকার্যে প্রত্যাশিত সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে আমাদের সমস্ত শুভানুধ্যায়ী, পাঠক, সমালোচক সকলকেই জানাই শারদীয় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

বিষয় কার্টুন

আগামী সংখ্যা

শতবর্ষে টিনটিনের স্রষ্টা হার্জে

১২৫ বর্ষে
যতীন্দ্রকুমার সেন

১৮৮২ : চন্দননগরে জন্ম, পরে শৈশবকাল অতিবাহিত হয় বিহারের দ্বারভাঙায়। পিতা পূর্ণচন্দ্র সেন, দ্বারভাঙার রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পূর্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আর এক পূর্ণচন্দ্র ছিলেন দ্বারভাঙা স্টেটের আর্কিটেক্ট, ইনি পূর্ণচন্দ্র বসু প্রথিতযশা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পিতা। দ্বারভাঙাতেই যতীন্দ্রকুমারের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ।

১৯০০ : যতীন্দ্রকুমার ভাগ্যান্বেষণে চলে এলেন কলকাতায়। থাকতেন অনুজ দেবেন্দ্রকুমার সেনের গৃহে যিনি ছিলেন বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজের অধ্যাপক। শৈশব থেকে চিত্রাঙ্কনের দক্ষতা যতীন্দ্রকুমারের সহজাত। যখন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে গেলেন, তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত পার্সী ব্রাউন তাঁকে পরীক্ষা করে বিস্ময়াপ্লুত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন...এখানে তোমাকে শেখাবার বিশেষ কিছু নেই ...।

১৮৮০ : বর্ধমান জেলার বামুনপাড়া গ্রামে রাজশেখর বসুর জন্ম, পরে যাঁর সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের জীবন নানা সূত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে আবদ্ধ হয়েছিল। রাজশেখরের জীবনের প্রথম সাত বছর কেটেছিল বিহারের মুঙ্গেরে।

১৮৮৮ : এই সময় থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত রাজশেখর দ্বারভাঙা রাজ হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন, ১৮৯৫তে তিনি এখান থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কারণ তাঁর পিতা চন্দ্রশেখরও ছিলেন দ্বারভাঙা স্টেটের কর্মচারী। পরবর্তী সময়ে রাজশেখর প্রেসিডন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। দ্বারভাঙাতেই যতীন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচয় ও সখ্যতা ঘটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজশেখরের অনুজ কৃষ্ণশেখরই ছিলেন যতীনের শৈশবের সহপাঠী।

১৯০১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' প্রতিষ্ঠা করেন । ঐ বছরই যতীন্দ্রকুমার উক্ত সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯০৩ : প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর প্রিয় ছাত্র রাজশেখরকে বেঙ্গল কেমিক্যালে যুক্ত করেন । রাজশেখর যোগ দেন 'কেমিস্ট' পদে। যতীন্দ্রকুমারের সঙ্গে তাঁর পুনঃ পরিচয় ঘটল। সম্ভবত এই সময় থেকেই রাজশেখর যতীনের চিত্রপ্রতিভা লক্ষ্য করে থাকবেন। জহুরীর জহর চিনতে ভুল হল না।

১৯১০ রাজশেখরের ইতিমধ্যে পদোন্নতি হয়েছে, এই সময় থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। নানা ধরনের প্রসাধনী দ্রব্য উৎপাদন শুরু হয়েছে এই বছর থেকেই। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণমান প্রচার করার জন্য রাজশেখর উন্নতমানের বিজ্ঞাপন প্রচারের পরিকল্পনা করলেন। তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত সাহিত্যপ্রতিভা ছিল তার প্রথম বিকাশলাভ ঘটল নানা বিজ্ঞাপন সৃষ্টির কাজে। পাশ্চাত্য পত্রপত্রিকায় দেখা বিজ্ঞাপনের ধরনে তিনি চিত্রসমৃদ্ধ বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা করলেন এবং তাঁর সেই পরিকল্পনাকে রেখার বিন্যাসে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন যতীন সেন। বলতে গেলে এই বিজ্ঞাপনের হাত ধরেই বাংলাদেশে কমার্শিয়াল আর্টের আগমন। যতীন্দ্রকুমার শিল্পায়িত সেই বিজ্ঞাপনগুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত হবার পর বেঙ্গল কেমিক্যালের পণ্যসামগ্রীর বিপণন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল।

অথচ ছবি আঁকায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকলেও যতীন চেয়েছিলেন ফোটোগ্রাফার কিংবা ল্যান্ডস্কেপ পেন্টার হতে, কিন্তু রাজশেখরের উপদেশেই কমার্শিয়াল আর্টে তাঁর হাতেখড়ি । বিজ্ঞাপনই শুধু নয় যতীন হয়ে উঠলেন সুদক্ষ লেবেল ও প্যাকেজিং ডিজাইনার। রাজশেখরের নির্দেশেই তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যালেন্ডারের অনবদ্য পেন্টিংগুলি সৃষ্টি করেন পৌরাণিক আখ্যান ও সংস্কৃত নাটকের ভাবধারায় ... 'মেঘদূত', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', 'শকুন্তলা' ... রবীন্দ্র কবিতা অভিসার এর চিত্ররূপ।

বাংলা বিজ্ঞাপন চিত্রে ক্যালিগ্রাফীর রূপই বদলে গেল ... এ প্রসঙ্গে যতীনের অকপট স্বীকারোক্তি "অক্ষরবিন্যাস ও লেবেল আঁকার হাতেখড়ি তাঁর কাছেই আমার হয়েছে। আগে অক্ষর লিখতে পারতাম না।" ...বলা বাহুল্য শিক্ষকটি হলেন ... রাজশেখর।

পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা বিজ্ঞাপন শিল্পকে যতীন্দ্রকুমারের পথে চিত্রসমৃদ্ধ করে তুলেছেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, যিনি প্রথমে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও পরে অন্যান্য সংস্থার সুরুচিপূর্ণ, সুদৃশ্য প্রচারচিত্র এঁকেছিলেন। সমসাময়িক বিনয় কুমার বসুর নাম উল্লেখের দাবি রাখে, শুধু বিজ্ঞাপন চিত্রেই নয় সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রে, বিশেষত মেয়েদের খোঁপা বাঁধার কারিকুরি নিয়ে রঙ্গচিত্রে ইনি যতীন্দ্রকুমারকে অনুসরণ করেছিলেন।

শুধু বিজ্ঞাপন চিত্রই নয় বাংলা বই-এর প্রচ্ছদ নির্মাণও প্রায় সে সময় থেকেই বটতলা বই-এর একমুখীতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চিত্রসমৃদ্ধ ও বর্ণবহুল হয়ে উঠল। সেই পরিবর্তনের মূল রূপকার ছিলেন যতীন্দ্রকুমার।

সেকালের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স ইত্যাদি নামি প্রকাশনা সংস্থার বই-এর প্রচ্ছদ অঙ্কনে তিনি যে বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তা বাংলা প্রকাশনা জগতের প্রচ্ছদশিল্পে নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দেয়। সত্যেন দত্তের কাব্য সঞ্চয়নের প্রচ্ছদে বংশীবাদক গ্রামের রাখাল ছেলে, প্রবোধ সান্যালের 'কাজললতা' উপন্যাসে কাজললতার আকৃতিতে চোখের ছবি কিংবা রাধারাণী দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'লীলা কমল' (১৩৪৬) বই-এর প্রচ্ছদে অর্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপি পদ্মের মাঝে কমনীয় দেবানন ও সেই বই-এর সেকেন্ড টাইটেল পেজে ধূপদান হাতে স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনবতী নারী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রণডঙ্কা' বইয়ের প্রচ্ছদে উটের পালের পাশে তাতার সৈন্যদের রণহুংকার ... এ ছাড়া গিরীন্দ্রকুমার বসুর 'স্বপ্ন', শশীশেখর বসুর 'যা দেখেছি যা শুনেছি', সত্যেন দত্তের 'ধূপের ধোঁয়া', প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মাঘ ১৩২৯ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশিত হল। এই গল্পটি 'শ্রীপরশুরাম' বিরচিত ও 'শ্রীনারদ' চিত্রিত। এরপর ক্রমান্বয়ে এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল 'মহাবিদ্যা' (ফাল্গুন ১৩২৯), 'চিকিৎসা সংকট' (কার্তিক ১৩৩০) 'ভূষণ্ডির মাঠে' (ফাল্গুন ১৩৩০), 'লম্বকর্ণ' (কার্তিক ১৩৩১)। উল্লেখিত পাঁচটি গল্পকে নিয়ে ১৩৩১ সালেই শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন পরশুরামের প্রথম বই 'গড্ডলিকা'। ভেতরের ছবি ও প্রচ্ছদ 'নারদ' রূপী যতীন্দ্রকুমার সেনের। পরশুরামের দ্বিতীয় গল্প সঙ্কলন 'কজ্জলী' এবং তৃতীয় 'হনুমানের স্বপ্ন' বেরিয়েছিল এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স থেকে যথাক্রমে ১৩৩৫ ও ১৩৪৪ সালে ... এই দুটি বই চিত্রিত করেছিলেন যতীন সেন। পরশুরামের 'রাতারাতি' তাঁর শেষ বিচিত্রিত গল্প যেটি সংকলিত হয়েছিল 'হনুমানের স্বপ্ন' বইটিতে। পরবর্তী পর্যায়ে পরশুরামের আরও পাঁচটি গল্প সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে যেগুলোর কোনোটিতেই যতীন ছবি আঁকেননি। এক বৎসরের মধ্যেই গড্ডলিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। রচনাকার রাজশেখর ও চিত্রকার যতীন্দ্রকুমার বন্দিত হন বাঙালি পাঠকসমাজে। 'প্রবাসী'তে অগ্রহায়ণ ১৩৩২ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন:

> **"লেখার দিক হইতে বইখানি আমার কাছে বিস্ময়কর, ইহাতে আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। চরিত্রগুলো ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পালাইবার ফাঁক নাই।**
>
> **গ্রন্থ সমালোচনার দাবি আমার কাছে প্রায় আসে। রক্ষা করিতে পারি না। লেখা আমার পছন্দ হয় না বলিয়া নয়, কর্মবন্ধনের পাক পাছে বাড়িয়া যায় এই ভয়ে। আজ ঝোঁকের মাথায় নিয়মভঙ্গ করিয়া ভীত হইলাম। ভূষণ্ডীর মাঠে একদা আমার যখন গতি হইবে তখন প্রেতদের সঙ্গে আমার কী ভাবের বোঝাপড়া ঘটিবে পরশুরামের উপর তাহার রিপোর্টের ভার রহিল কিন্তু যতীন্দ্রকুমারের কাছে দরবার এই যে আমার প্রেতশরীরের প্রতিরূপটির প্রতি মসীলেপন সম্বন্ধে করুণ ব্যবহার করিবেন।"**

'গড্ডলিকা'র পরবর্তী সংস্করণ বের করেছিলেন এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স এবং একাদিক্রমে ১৩৯২ সাল পর্যন্ত এর ১৮টি সংস্করণ মুদ্রিত করতে হয়েছিল। 'গড্ডলিকা'র চিত্ররূপ প্রসঙ্গে স্বয়ং যতীন সেন লিখেছেন:

> **"সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড- এর চরিত্রগুলির চিত্ররূপ ও তাদের বিশেষত্ব স্বয়ং রাজশেখর স্কেচ করে ও লিখে তাঁকে যেভাবে জানিয়েছিলেন তিনি সেভাবেই চরিত্রগুলি চিত্রায়িত করেছিলেন।"**

বই অলংকরণের পাশাপাশি যতীন পত্রিকা অলংকরণও শুরু করেন, বিশেষত ভারতবর্ষ পত্রিকার নানা বিভাগের টাইটেল চিত্রগুলো তাঁরই আঁকা। এ ব্যতীত প্রকাশিত তাঁর আঁকা ব্যঙ্গচিত্র (রঙিন ও সাদা-কালো দুই-ই) এবং নিসর্গচিত্র যা আর্টপ্লেটে ছাপা হত তৎকালীন পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর আঁকা ছবি নিয়ে একখানি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল যার হদিস এখন পাওয়া যায় না। বহু বিদ্বজন যতীনের ছবির ভক্ত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় চেয়েছিলেন সচিত্র রবীন্দ্ররচনা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করতে। রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' রচনাটি নন্দলাল বসুর অলংকরণ সমৃদ্ধ হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল 'বিচিত্রা'র পাতায়।

শুধু তাই নয়, 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্র উপন্যাস চিত্রসমৃদ্ধ করে প্রকাশ করবার বাসনা নিয়ে উপেন্দ্রনাথ কবির সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি শুনেছিলেন যতীন্দ্রকুমারের চিত্রকলা কবির প্রিয়, তিনি সরাসরি যতীন্দ্রকুমারকে দিয়ে কবির উপন্যাস চিত্রায়িত করার পরিকল্পনা কবির কাছে উপস্থাপিত করলেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর রবীন্দ্রনাথ জানালেন যতীন্দ্রকুমার যদি ছবি

লীলাকমল

• রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থের অলংকরণ (১৯৪০)

• শ্রীগৌতম ভদ্র ও CSSSC Archives-এর সৌজন্যে

গড্ডলিকা বইয়ের ছবি আঁকেন যতীন সেন। চরিত্রের দিক থেকে এই ছবিগুলি আশ্চর্য রকমের বাঙালী। পরশুরামের বংশলোচন, বুঁচকি, গন্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, ছাগল লম্বকর্ণ প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় চরিত্রগুলির ছবি এঁকে শিল্পী যতীন সেন বাঙালী পাঠকের স্মৃতিতে তাদের জীবন্ত করে রেখেছেন।

- রঘুনাথ গোস্বামী
(বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণ)
গ্রন্থ : দুই শতকের বাংলা বই
সম্পাদনা : চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁকেন তবে তিনি সম্মতি দিতে পারেন নিশ্চিন্ত হয়ে। কিন্তু এ কথা জেনে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে স্বয়ং যতীন্দ্রকুমার জানালেন এত বড়ো বিশ্বাসকে বিপন্ন করতে তিনি চান না। তবে উপেন্দ্রনাথ ছাড়ার পাত্র নন, তাঁর প্রয়াসে কবির সঙ্গে দেখা করলেন যতীন্দ্রকুমার, জানালেন ... কবির সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি চিত্ররূপ দেবেন এবং কবির মনের মতো না হওয়া পর্যন্ত কোনো ছবি প্রকাশ করা চলবে না। এ প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সম্মত হলেন না। তিনি বলেছিলেন ... শিল্পী তিনি মনোনীত করতে পারেন, কিন্তু চিত্র মনোনয়ন করবেন স্বয়ং চিত্রশিল্পী। ফলে উপেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা সফল হল না। তবে রসস্রষ্টা সুকুমার রায়ের 'চলচিত্ত চঞ্চরী'র চরিত্রাঙ্কন করেছিলেন যতীন সেন, যেটি 'বিচিত্রা'র পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালে, আশ্বিন সংখ্যায় সুকুমার রায়ের তিরোধানের পর (তথ্যসূত্র: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা'; লেখিকা: চিত্রা দেব; দেশ সাহিত্য সংখ্যা/১৩৯৭)। অবশ্য প্রায় সমসাময়িক ১৯৩১ সালে নরেন্দ্র দেবের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের ১৬টি কবিতা নিয়ে এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'কাব্য দীপালী', তাতে অলংকরণ করেছিলেন বেশ কয়েকজন। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, যাঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন সেনও। অন্যরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, চারু রায়, হেমেন মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও বিনয় বসু।

ছোটোদের জন্য সেরকমভাবে যতীন সেন ছবি আঁকেননি, কিন্তু যখন আঁকতেন মনের সমস্ত সুষমা দিয়ে আঁকতেন, ক্রীড়ারত শিশুর দু-তিনটি রঙিন ছবি দেখে বোঝা যায় যে ছবিগুলো কী ধরনের স্নিগ্ধ বর্ণময় রূপ নিত।

ছোটদের জন্য কাজ করবার সুযোগ এলে তাঁর সুযোগ্য প্রতিভা কীভাবে বিকশিত হত তা বোঝা যায় গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লাল কালো' বইটি দেখলে। বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩৭ সালে প্রবাসী প্রেস থেকে বইটি মুদ্রিত হয়েছিল। এ বইয়ের প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা যতীন সেনের যা বিশ্বখ্যাত অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড -এর জন টেনিয়েল'এর অলংকরণকে মনে করিয়ে দেয়। বই-এর ভেতর পিঁপড়ে, গিরগিটি, নানা ধরনের পাখি, ব্যাঙ এসবের অনবদ্য সাদা-কালো, লাল-কালো ছবি ছাড়াও ১৩টি বহুবর্ণ ছবি, সেই সঙ্গে লেখক গিরীন্দ্রশেখরের অননুকরণীয় রচনাশৈলী বইটিকে ক্লাসিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। এই বইয়ের ছবিগুলো দেখে আরও বোঝা যায় পশুপাখি ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের শারীরিক গড়ন কী নিখুঁত ভাবে যতীনের ছবিতে ধরা দিয়েছে। অনতিকালের মধ্যেই খ্যাতিমান হয়ে ওঠা দুই আলংকারিক শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পর্যায়ের আঁকা দেখলে বোঝা যায় কীভাবে তাঁরা যতীন সেনের ছবি দেখে প্রভাবিত হয়েছেন। তবে পশ্চাদবর্তী সময়ে তাঁরা নিজস্ব স্টাইলে বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। এই সূত্রে আরও কিছু শিল্পীর নামও হয়তো তালিকায় যোগ হতে পারে।

শুধু বই-ই নয় পত্রিকার প্রচ্ছদ অঙ্কনেও যতীন্দ্রকুমারের অনবদ্য রেখা ও বর্ণ প্রয়োগের উৎকর্ষতা দেখা গেল। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিচিত্রা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী চারু রায়। পরবর্তী প্রচ্ছদ রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হল যতীন সেনকে। উপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ...

> "বিচিত্রার প্রচ্ছদ অঙ্কনের কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের দৃষ্টির সামনে যতীন্দ্রকুমার যখন সেটি মেলে ধরলেন, রঙ ও রেখার বিচিত্র লীলা দেখে আমাদের চক্ষু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আশ্বিন মাস থেকে বিচিত্রায় সেই প্রচ্ছদটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। বাংলা মাসিকের প্রচ্ছদের ইতিহাসে বিচিত্রার সেই অপরূপ প্রচ্ছদটি একটি আদর্শ (Classic) হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত বোধকরি সে প্রচ্ছদটি অপরাজিত।"

১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আত্মপ্রকাশ করল 'কল্লোল' পত্রিকা গোকুল নাগ ও দীনেশ রঞ্জন দাসের প্রয়াসে। এ পত্রিকায় প্রচ্ছদ বদল হয়েছিল পাঁচবার। ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন যতীন্দ্রকুমার ...। সাগরের বুকে একটি মাত্র ঢেউ উঠেছে, তার ওপরে ফুটে আছে শিরোনাম 'কল্লোল'।

১৩৪০ সালের ৮ অগ্রহায়ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়, ঐ দিন সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ'- এর আবির্ভাব। এই পত্রিকার স্থাপনের পেছনে ছিল স্বদেশি ভাবনার প্রেরণা, সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে যতীন্দ্রকুমার সৃষ্টি করলেন অপূর্ব এক প্রচ্ছদ ... পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালের ২৫ জুন 'দেশ' পত্রিকাতে এক স্মৃতিচারণে তিনি সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন:

> ২১ বছর আগে রাত ৯টার সময় ১৪নং পার্শিবাগানে স্বর্গত সুরেশ মজুমদার ও শ্রী মাখনলাল সেন এসে অতি ব্যস্ত হয়ে জানালেন, সাপ্তাহিক বার করছি। নাম 'দেশ'। মলাট চাই। সময় মাত্র দুদিন। সব প্রস্তুত, শুধু মলাট নেই। মলাট হবে দু-রঙে লাইন ব্লকে। জানালাম, ৩/৪ দিনের আগে হবে না। হাতে অনেক কাজ। ওঁদের সঙ্গে ব্লকমেকার অমূল্য সেনও ছিলেন। তিনি বললেন, দুদিনের বেশি সময় নিলে Two Colour Block হবে না। বন্ধু সুরেশ মজুমদার ও মাখন সেন বললেন 'আর কোনও কথা নেই। ঠিক দুদিন পরে এই সময় এসে মলাট নিয়ে যাবই। যেমন করে হোক করে দিতেই হবে।' দুদিনেই মলাট এঁকে দিলাম। আড়ম্বরের সময় ছিল না, সাদাসিদে Symbolic Design হল। বন্ধু সুরেশ মজুমদার ও মাখন সেন জিজ্ঞাসা করলেন, মলাট দেখে মানে বলুন। জানালাম, 'অগ্নি বেষ্টনীর মধ্যে সূর্য-কিরিটিনী দেশ পর্বতের মত অচল।' দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'বাঃ! সমসাময়িক' । মজুমদার বললেন, 'মানেটা ছেপে দিলে কি হয়?' বললাম, 'না। যারা বুঝবার ঠিক বুঝবে।' ঠিক চার দিনের মধ্যে ক্রিম কাগজ লাল ও নীল রং-এ ছাপা মলাট নিয়ে 'দেশ'

আত্মপ্রকাশ করল। অগ্নিবেষ্টনীর পরিকল্পনা নটরাজের মূর্তির বেষ্টনীর পরিকল্পনা থেকে নেওয়া। মলাটের নীচে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন আমারই যোগাযোগে ছাপা হয়। ছবিটা আমার (ঢাকী) আঁকা। ঐ কোম্পানির বিজ্ঞাপন আজও অব্যাহত আছে। আমার আঁকা প্রথম মলাট নিয়ে 'দেশ' পত্রিকা যে শৈশব থেকে যৌবনে এগিয়ে চলেছে এর আনন্দ আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করছি। আমার পরে যে সব কৃতী শিল্পী 'দেশ'-এর মলাট শোভাবর্ধন করে আসছেন তাঁরাও আমারি দলে, তাঁরা 'দেশ'-এর অঙ্গে যে বিভিন্ন শোভার ছাপ দিচ্ছেন তা মনোরম।

আর একটি স্মরণীয় কাজ করেছিলেন যতীন তা হল তখনকার সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের লোগো। হস্তী যুগল শোভিত সেই লোগোয় তাঁরই হস্তাক্ষরে নির্মিত হয়েছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সেই অসাধারণ উক্তি:

জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্ অর্থাৎ জীবিতের জ্যোতি ছায়াতে পরিলক্ষিত হোক।

কালীঘাটের পটের কিছু ছবিকে বাংলা ব্যঙ্গচিত্রের জনক বলা যায়। পটের হাত ধরে এল বটতলা বই-এর কিছু কিছু রঙ্গচিত্র। পরে বাংলা ব্যঙ্গচিত্রকে জাতে তুললেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রদর্শিত পথে চারু রায় ও দীনেশ রঞ্জন দাস শুরু করেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র চর্চা, এঁদের থেকে বয়সে বড়ো হলেও যতীন সেন কার্টুন আঁকতে শুরু করেন কিছু সময় পরে। তাঁর আঁকা কার্টুনের বিষয়বস্তু ছিল মূলত সামাজিক অসঙ্গতি ও চতুঃস্পার্শের ঘটমান নানা পরিস্থিতি। ঠিক সে সময়ে শিক্ষার আলো বাঙালির অন্দরমহলে মেয়েদের কাছে পৌঁছে গেছে। শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, চিকিৎসক ইত্যাদি পেশায় বাঙালি মহিলারা আসতে শুরু করেছেন, যদিও অফিস, আদালত, দোকান - বাজারে তাঁদের আনাগোনা তখনও অনেক সীমাবদ্ধ। কার্টুনিস্টের দূরদৃষ্টি দিয়ে যতীন দেখতে পেলেন মেয়েরা পুলিশ, উকিল, হাকিম সবই হচ্ছে... শুধু তাই নয় পোশাকের ক্রমবিবর্তনে তাঁরা পুরুষের মতো বেশবাস পড়তে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্যের কথা যতীন সেনের কৌতুক দৃশ্যে যার আভাস ছিল আজ তার বাস্তবায়িত দৈনন্দিন দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর্থিক অনটন ও বাস্তবের চাহিদা মেটাতে বাঙালি মেয়েদের বাইরের জগতে প্রবেশ আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে পোশাকের ব্যাপক বিবর্তন ঘটে গেছে।

যতীনের 'সমাজচিত্র' সিরিজে আছে পণপ্রথা নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, 'গার্হস্থ্য' সিরিজে ছেলেদের গেরস্থের ঘরের মেয়েদের দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়া কিংবা বাঙালি শিক্ষিত স্ত্রৈণ পুরুষের আচরণ, 'নারীবিদ্রোহ' সিরিজে মেয়েদের পুরুষালি কাজ বা ভাবভঙ্গিতে আকৃষ্ট হওয়া নিয়ে রঙ্গচিত্রের অবতারণা আছে। যতীনের কার্টুন ভারতবর্ষ, সচিত্র শিশির, মানসী ও মর্মবাণী, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় দৃশ্যমান। পরের ব্যঙ্গচিত্রীদের মধ্যে স্বল্পায়ু চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কুমার বসু, হরিপদ রায় যতীনের ছবির কৌতুক বিন্যাস ও আঁকার স্টাইল ব্যবহার করেছেন। বিশেষত বিনয়কুমার ও মেয়েদের নানা বৃত্তিমূলক কাজে অগ্রসর হওয়াকে বক্রদৃষ্টিতে দেখে কার্টুন করেছেন।

কীর্তিমান যতীন্দ্রকুমারের কীর্তির আর একটি নতুন সংযোজন — এতেও আছেন অবিস্মরণীয় রাজশেখর। ১৯৩৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'লাইনো টাইপ' কোম্পানির শোরুমে বাংলা লাইনো টাইপ মেশিনের উদ্বোধন করেছিলেন। রাজশেখর বসুর সহায়তায় এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যমে ভারতবর্ষে প্রথম লাইনো মেশিন তৈরি হল। বাংলা যুক্তাক্ষরের জট ছাড়িয়ে একে সহজ সরল করতে রাজশেখর ও যোগেশচন্দ্র রায় অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সেইসঙ্গে সুশীলকুমার ভট্টাচার্যের সহায়তায় মূল অক্ষরগুলির আকৃতি অঙ্কন করেছিলেন যতীন্দ্র কুমার। ঐ বৎসর থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার মুদ্রণে প্রথম লাইনো টাইপ ব্যবহার হয়, ধীরে ধীরে সে ব্যবহার বাড়তে থাকে।

[দ্রঃ 'হনুমানের স্বপ্ন' ১ম লাইনোটাইপে মুদ্রিত বই

- **তথ্যসূত্রঃ দেশ...পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস (দেশ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৯০), লেখকঃ সুনীল দাস]**

অজেয় শিল্পী হলেও কলম সঞ্চালনেও যতীন সেন ছিলেন স্বচ্ছন্দ। তাঁর রচনাগুলি ছিল 'রচিত্রিত' (যতীন্দ্রকুমারের স্বউদ্ভাবিত শব্দ)। ছবি ও লেখার অনবদ্য সহাবস্থান বাংলা সাময়িক পত্রিকার পাঠকমহলের কাছে প্রায় অপরিচিত ছিল, মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে পাঠককুল একে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ছবির মতো রচনার ক্ষেত্রেও যতীন ছিলেন কৃপণ। তাঁর রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষ, দেশ, মানসী ও মর্মবাণী, সচিত্র শিশির, বসুধারা, কথাসাহিত্য, মৌচাক প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর জীবিতকালে তাঁর লেখার কোনো সঙ্কলন প্রকাশিত হয়নি। জানুয়ারি ২০০১ সালে "ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন রচনা সংগ্রহ" শীর্ষক বইটি প্রকাশ করেন আনন্দ পাবলিশার্স। বইটির সম্পাদনা ও সঙ্কলন করেছিলেন অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ। তাঁর প্রয়াসে যতীন্দ্রকুমারের ১৩টি রচনা ও ৫২টি ব্যঙ্গচিত্রের সমাবেশ বইটিতে দেখা যায়, স্বলিখিত ভূমিকায় সম্পাদক যতীন সেন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশন করেন।

চিত্রশিল্প ও সাহিত্য কর্ম ছাড়াও সংস্কৃতির আর একদিকে অভিনয়ের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন যতীন সেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উৎকেন্দ্র সমিতির উৎসাহী সভ্যরা দুবার

কামিনী-কুন্তল – যতীন্দ্রকুমারের রেখায় প্রমীলামহলের কবরী বৈচিত্র্য

• মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৬

এই নাটকের মঞ্চাভিনয় করেছিলেন। সে নাটকে অংশগ্রহণ না করলেও তার অভিনয় পরিচালনা ও শিল্প নির্দেশনা দুটি কাজই সফলভাবে করেছিলেন যতীন। শুধু এ নাটকে কয়েকটা গান ছিল, সে গানগুলি লিখে তাতে সুরও বসিয়েছিলেন যতীন। অভিনয় যারা দেখলেন তারা মুগ্ধ হলেন, তাদের অনেকের অনুরোধে নাটকটি বই হয়ে প্রকাশিত হল এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে ১৩৩৫ সালে। ... সে বইয়ের ভূমিকায় পরশুরাম স্বয়ং লিখলেন :

> "এই গল্পের লেখাগুলির সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কারণ এককালে তিনি ছবি আঁকিয়া ইহাদের রূপ দিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু কাগজের উপর তুলি চালাইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, কথায় গানে হাস্যে দৃশ্যে জীবন্ত ছবি আঁকিতে চান। তাই গল্পটি নাটিকায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।
>
> 'যতীন্দ্রকুমারের শিক্ষায়' উৎকেন্দ্র সমিতি কয়েকবার ইহার অভিনয় করেন। অভিনয় দেখিয়া দর্শকগণ খুশী হন অর্থাৎ খুব হাসেন। অনেকে নিজেরা অভিনয় করিতে চান। তাঁহাদের অনুরোধে এই নাটিকা ছাপা হইল।"

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে অভিনয়ের সঙ্গে সংগীতেও যতীনের ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে উচ্চাঙ্গসংগীত ও যন্ত্রসংগীত দুয়ের উপরেই তাঁর দখল ছিল। প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র। অভিনয় ক্ষমতা থাকলেও যেমন মঞ্চে অভিনয় করেননি, তেমন সংগীত দক্ষতা থাকলেও তিনি প্রকাশ্যে সংগীত পরিবেশন করেননি। নেপথ্যবিলাসী যতীন্দ্রকুমার নিস্পৃহ দৃষ্টিতে খ্যাতি ও প্রচারের আলোকে লক্ষ্য করেছেন কিন্তু সে আলোর বৃত্তে নিজে গিয়ে কখনও দাঁড়াননি।

- বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়
- তথ্যসংযোজন: সুগত রায়

যতীন্দ্রকুমার অঙ্কিত নিউ থিয়েটার্সের ঐতিহাসিক লোগো

যতীন্দ্রকুমারের চিত্রকলা

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

একদিন সকালে উঠিয়া বায়রন দেখিলেন, তিনি জগদ্বিখ্যাত। সকল কবির অদৃষ্ট এমন সুপ্রসন্ন নহে। অধিকাংশ কলাবিদের কপালেই সহসা সৌভাগ্য ঘটে না। কবিতার একটু সমাদরের জন্য ব্রাউনিঙকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল জীবনের সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত। রেমব্রান্ট মরিয়া অমর হইবার অধিকার পাইয়াছেন। অজন্তার চিত্রকরের নাম লোকে জানে না। কবি ভবভূতিকে' নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী'র উপর রসগ্রহণের বরাত দিতে হইয়াছিল।

শিল্পরসিকের কাছে যতীন্দ্রকুমার আজ অপরিচিত নহেন। তাঁহার চিত্রকলার মর্যাদা বুঝিতে লোকের অনেকদিন লাগিয়াছে। তবু এ পর্যন্ত, কত বড়ো শক্তিশালী যে এই চিত্রকর, সাধারণের মধ্যে সে ধারণা স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। অপরাধ শুধু সাধারণের নহে, অনন্য-সাধারণ ঔদাসীন্যের ভরে দ্রষ্টা-সমাজের সহিত পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা হইতে একান্ত ভাবে বিরত থাকিতে শিল্পী বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। যতীন্দ্রকুমারের আর্ট বাজারে বিক্রীত হইত না, যতীন্দ্রকুমারের কলা বিজ্ঞাপন চিত্রে আবদ্ধ থাকিত। মাসিক পত্রসমূহে যতীন্দ্রকুমারের রঙ্গচিত্র মাত্র প্রকাশিত হইত; তাও কালেভদ্রে। কলাপ্রদর্শনীতে যতীন্দ্রকুমারের ছবির সম্ভার সুদুর্লভ ছিল। পার স্পরিক প্রশংসা-পরিষদের সদস্য হইয়া উঠিবার অবসরও তাঁহার মিলে নাই। এত করিয়াও সমঝদার-সমাজে অপরিচিত হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য যে তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না, সে অপরাধ যতীন্দ্রকুমারের নহে, অপরাধ তাঁহার কলা প্রতিভার।

এই উদাসীন শিল্পসাধক সারা জীবন সাধনাই করিয়া আসিল—'যশো দেহি, ধনং দেহি'র প্রার্থনা মন্ত্রটা পর্যন্ত কলা দেবতার মন্দিরে ভালো করিয়া আবৃত্তি করিয়া উঠিবার প্রবৃত্তি অন্তরের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। কাজেই রস ও রুচিবোধের ঐকান্তিক অভাব যাহারা অর্থের মহিমায় কোনোরূপ ঢাকিয়া রাখিতে, গৃহপ্রাচীর বিকৃতির প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত ও অসৌন্দর্যে আবৃত করিয়া তুলিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই রত্নভারবাহী রাজারাজড়ার ঘর যতীন্দ্রকুমারের শিল্প সুষমার মায়াস্পর্শ হইতে বড় বাঁচনটাই বাঁচিয়া গেল।

কুমারব্রত ধারণ করিলেও সংসার তাহার দাবি ছাড়ে না। অর্থের প্রয়োজনে ব্যবসায়-চিত্রেও যতীন্দ্রকুমারকে মনোনিবেশ করতে হয়। ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে, কলার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনাতিরিক্ত চিরন্তন আনন্দে। প্রয়োজনের ভিতর দিয়াও কিন্তু আনন্দকে বিকশিত করা চলে, ক্ষণিকের মধ্যে দিয়াও অনন্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

কমার্সিয়াল আর্ট জিনিসটা কলাজগতে আজ নিজের স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। একদা চিত্রকলাকে ধর্ম ও চার্চের অনুবর্তী হইয়া চালিত হইয়াছিল। ধর্মের প্রভাব ফেলিয়া আর্ট কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই বৈশ্য-যুগের ব্যবসায়ের প্রভাব কাটাইয়া ওঠা তাহার পক্ষে আরো কঠিন। চিত্রকরের প্রয়োজন অর্থের, ব্যবসাদারের প্রয়োজন বিজ্ঞাপনের, তাই কলার বহু বিভাগের মধ্যে ব্যবসায়গত চিত্রের স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইহাকে অল্প কষ্ট সহিতে হয় নাই। অনেকগুলি শক্তিশালী শিল্পী অভিমান বিসর্জন দিয়া বিজ্ঞাপন চিত্রে আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল এবং করিয়াছে বলিয়াই ইহা আজও অপাঙক্তেয় হইয়া থাকিতে পারে নাই। ব্যবসাযের ক্ষেত্রে থকিয়াও সেই প্রতিভাশালী আর্টিস্টের দল এই ধরনের চিত্রকলাকে বিজ্ঞাপনের জগৎ হইতে শিল্পকর্মর স্বর্গে টানিয়া তুলিয়াছে।

প্রতীচ্যে কমার্সিয়াল আর্ট বস্তুটি এখন আর হেয় নয়। নামজাদা চিত্রকররা আজ কমার্সিয়াল আর্টিস্ট বলিয়া অভিহিত হইতে সঙ্কোচ বোধ করে না। ব্যবসায় চিত্রের ভিতর দিয়াই তাহারা নিজেদের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করে। তাই ব্যবসায়ের অসঙ্গতি ও অসৌন্দর্যের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াও এই ধরনের বিচিত্র চিত্রকলা রসিকজনের চিত্ত হরণ করতে অসমর্থ হয় নাই।

আমাদের দেশে এই কমার্সিয়াল আর্ট আজ অপরিচিত নহে। বড়ো বড়ো ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন এখন কতক বিলাতি ও কতক অজন্তাভঙ্গির চিত্রে ও চারুলিখনে শোভিত হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্বেও এ দেশে এই ধরনের শিল্পকলা অজ্ঞাত ছিল। এইরূপ প্রচার-কৌশলের প্রচলন কতকটা হইয়াছে বটে, যথেষ্ট হয় নাই। এখনও রাশিরাশি টাকা খরচ করিয়া, বাঙালি মেয়ের শাড়ি জড়ানো অঙ্গের উপর বেমালুম মেমের মুখ বসাইয়া, অসম্ভব গাছে অদ্ভুত ফুল ফুটি ইয়া, বিদেশি দৃশ্যের মধ্যে স্বদেশি নারী-পুরুষের অবতারণা করিয়া নানারূপ হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়। চিত্রের নামে বিচিত্র কদর্যতার অসদ্ভাব মোটেই নাই।

এই ব্যবসায়-ক্লিষ্ট আর্টের প্রথম প্রচারক বাঙালির প্রথম সার্থক প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'। আর এই Commercial School of Art—এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন।

ব্যবসায় চিত্রের ভিতর দিয়াই যতীন্দ্রকুমারের চিত্রকলার সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। বিজ্ঞাপনের পাতা উল্‌টাতেই হঠাৎ চোখে পড়িল একখানি অপরূপ ছবি, 'কখন ফুটলো কমল আমি দেখি নাই।' দশবছরের চিত্রসূচি উল্‌টাইলেও সচিত্র মাসিক পত্রগুলির অঙ্গের ভিতর তেমন একখানি ছবির সাক্ষাৎ মিলিবে না। পল্বলে পদ্মরাশি ফুটিয়াছে, আর তাহারি চারিধার ঘিরিয়া সুন্দরীর দল তনুর অপূর্ব ভঙ্গিমা অভিব্যঞ্জিত করিয়া কমলদলের দিকে চাহিয়া আছে—দেহের হিল্লোলে এখনি বুঝি তাহাদের বিচিত্র অলঙ্কারাভরণ সিঞ্জিত হইয়া উঠিবে, এমনি সে ছবি। হাঁ চিত্রকর বটে! কিন্তু কে এ শিল্পী?

খোঁজ করিয়া জানিলাম, এ সেই বিদ্রুপাত্মক চিত্রে অকুণ্ঠ চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার। অনুকরণে অনুকরণে যতীন্দ্রকুমারের 'খোঁপা' পুরানো হইয়া গেছে, 'বৈষ্ণবী খোঁপা', 'জ্যাকজনসন খোঁপা', 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট খোঁপা' তবু এখনো অপূর্ব। পড়ার চাপে নুব্জদেহ বাঙালির ছেলের পিঠের উপর বইয়ের বোঝা, তাহার ওপর ঘোমটা ঢাকা চেলী জড়ানো একটি কচি বউ—"বোঝার ওপর শাকের আঁটি"— চিত্রে এমন সরস ও পরিস্ফুট পরিহাস রসিকতার প্রকাশ কার্টুন জগতে দুর্লভ।

গল্পকে সচিত্র করিবার প্রয়াস পূর্বে হয় নাই—এমন নয়। সেগুলির মতো হাস্যকর ছেলেখেলাও কিন্তু আর হয় নাই। গল্পকে চিত্রে এবং চিত্রকে গল্পে বিবৃত করিবার সার্থক পদ্ধতি যতীন্দ্রকুমারই প্রথম প্রয়োগ করেন। "মানসী"-তে 'ক্ষণজন্মার আত্মকাহিনী' তাহারই রচনা।

তারপর 'পরশুরাম' ও 'নারদে'র সহযোগিতা সম্ভূত নতুন সৃষ্টির রসজগতে এক অপূর্ব আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্বোধন করিল। একদিকে লেখার ছন্দে জীবন-রঙ্গের নবনবোন্মেষ; আর একদিকে রেখার ভঙ্গে রসের হিল্লোলের উল্লসিত লীলা। দুই অদ্ভুত প্রতিভার সম্মিলনের মধ্যে দিয়া যে হাসির ঝরনা নির্ঝরিত হইতে লাগিল, তাহার প্রবাহে ভাসিয়া গেল যত থিয়েটারি কান্না, সেন্টিমেন্টাল দীর্ঘনিশ্বাস, মেলোড্রামাটিক হা-হুতাশ, কচি বুকের কোমল ট্র্যাজেডি, যৌবন বিকারের সাইকোলজিক্যাল প্রলাপ, উপন্যাসের মাপা রস, আর্টের বাঁধা বুলি, সাহিত্যের চাপা সুর আর বিকল চিত্রকলার বৈচিত্রহীন ভঙ্গিমা।

প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্র লইয়া যতীন্দ্রকুমারের চিত্রজীবনের আরম্ভ। ল্যান্ডস্কেপ-পেন্টিং-এ তাঁহার কৃতিত্ব আজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত; অথচ এই দৃশ্য চিত্রের অদৃশ্য আকর্ষণ শিল্পী আজও মর্মে মর্মে অনুভব করেন। দৃশ্য-চিত্রাঙ্কনে ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতির প্রয়োগ এক অপূর্ব উপভোগ্য জিনিস হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যতের আশায় বিশ্বাস করিয়া অতি উল্লসিত হইবারও কোনো কারণ নাই; কেন না বিপুল বৈরাগ্য কাটাইয়া নতুন সৃষ্টিতে হাত দেওয়া শিল্পীর পক্ষে যে কি করুণরসাত্মক নিদারুণ ব্যাপার, তাহা শিল্পীই জানে, আর জানে তাঁহার বন্ধুগণ।

চিত্রজগতে যতীন্দ্রকুমারের প্রতিভা বহুমুখী। প্রতিকৃতি চিত্রেও তাঁহার দক্ষতা অল্প নহে। নক্সাতে তিনি সুনিপুণ, ডিজাইনে তিনি সপটু, এমনকি ফটোগ্রাফির যান্ত্রিক বিদ্যাটা পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আয়ত্ত করিতেও তিনি অবহেলা করেন নাই।

কমার্সিয়াল আর্ট, কার্টুন অথবা গল্পের চিত্র-বিবৃতিই যদি শিল্পের শক্তি নিঃশেষিত হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে হয়তো শক্তিশালী কলাবিদ বলিতাম, কিন্তু প্রথম শ্রেণির আর্টিস্ট বলিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

যতীন্দ্রকুমারের দুই একখানিমাত্র ভাবচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রচুর হইলেও সেই দুইএকখানিতেই কিন্তু যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, গুণবিচার কালে সমঝদারের কাছে তাহাই যথেষ্ট। 'ক্ষণপ্রভা' বলিয়া যে ছবিখানি শিল্পীর নাম-সংযুক্ত একখানি ক্ষীণকায় অ্যালবামে দেখা যায়, বিকৃত ব্লকের অস্পষ্ট রেখা ও জোবড়ানো রং-এর বিরূপ আবরণীর ভিতর দিয়াও রসিকের চোখে তাহার রূপ ধরা পড়িতে দেরি লাগে না। ধূসর কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের বিকাশ, আর সেই ঝলকিত বিজলী রেখার প্রকট অন্তরালে রমণীরূপিণী তড়িল্লতার জ্যোতির্ময় রূপ। গাঢ় গুরুভার একবর্ণের ব্যাক-গ্রাউন্ড ছবির প্রায় সমস্তটাই অধিকার করিয়া আছে। সেই ঘন মেঘাবরণের বুক চিরিয়া অতি উজ্জ্বল আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের কয়েকটি রেখা সুতীব্র শুভ্রতায় ঝলসিয়া উঠিয়া রেখার টানেটানে আকস্মিক বিস্ময় ফুটাইয়া তুলিয়াছে 'ক্ষণপ্রভা'র ক্ষীণ তণুর মোহন মহিমা।

বর্ণবিন্যাসেও যে শিল্পীর ক্ষমতা সামান্য নহে, এই ভাবভাস্বর বর্ণচিত্রখানি তাহার প্রমাণ। চিত্রকলা অন্যান্য বিভাগের মতো বর্ণলোপের নিগুঢ় তত্ত্বটি তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, এ কথা বোঝা যায়, এবং নতুন রচনার অপ্রাচুর্যে ইহাও বেশ বোঝা যায় যে, আয়ত্ত্ব বিদ্যার প্রয়োগে কৃপণতা শিল্পীর প্রকৃতিসিদ্ধ।

ব্যবসায়গত এবং স্বতঃস্ফূর্ত তাঁহার আঁকা উভয়বিধ কলাচিত্রে চোখ বুলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যতীন্দ্রকুমার প্রধানত রেখাশিল্পী। রেখাকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার শিল্পকলা বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রেখার এমন নিঃসঙ্কোচ গতি অন্য কোনো শিল্পীর চিত্রে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। একদিকে যেমন রেখায় লীলায়িত লীলায় রমণীর সুললিত রূপ এবং শিশুর সুকুমার দেহ কোমল মাধুর্যে ভরিয়া গিয়াছে, অন্য দিকে তেমনই পুরুষের সবল পৌরুষ এবং সরল সৌন্দর্য রেখার দুই-চারিটি কুণ্ঠাহীন ঋজু টানে স্বাধীন আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকলার অন্য ক্ষেত্রে শিল্পী শক্তিশালী, রেখাচিত্রে তিনি অদ্বিতীয়।

যতীন্দ্রকুমারের প্রতিভা বিশেষভাবে স্ফূর্তি পাইয়াছে আলঙ্করিক কলায়। Ornamental অথবা Decorative Art এ সফলতা লাভ করিতে হইলে অশিক্ষিত পটুত্বে চলে না। জোড়াতাড়া দিয়া কাজ চালানো এবং অনাবশ্যক ভারের অনভিজ্ঞ বিন্যাসকে আলঙ্কারিক কলা বলে না। একদিক দিয়া বিশেষ অনুপাত বোধ, সুষমানুভূতি ও সূক্ষ্মাপর্যবেক্ষণ শক্তি অন্যদিক দিয়া সাধনা, প্রয়োগকৌশল ও রেখাপাতের নিঃসঙ্কোচ স্পষ্টতার একান্ত প্রয়োজন। প্রকাশের সুষমা যদি আর্ট হয়, তো যতীন্দ্রকুমার প্রথম শ্রেণির আর্টিস্ট।

রুচির বিভিন্নতা এবং ঘনিষ্ঠতার অভাব—যে কারণেই হোক, জাপানি অথবা চৈনিক আর্ট যতীন্দ্রকুমারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য কলা পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইয়া, পরে ভারতীয় চিত্রকলাকেই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাই যতীন্দ্রকুমারের কলাচিত্র আধুনিক ভাবে প্রাচ্য নয় বটে—কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়।

সৌন্দর্যজ্ঞান, রসজ্ঞতা, সামঞ্জস্য ও অনুপাতবোধ, সূক্ষ্মদর্শন, পর্যবেক্ষণের অসামান্য ক্ষমতা, রেখা কৌশল ও কলমের টানের উপর অসাধারণ কর্তৃত্ব এতগুলি গুণের অবিসম্বাদী, অ[illegible]রী হইয়াও যতীন্দ্রকুমার আজ পর্যন্ত সম্ভাব্যতার বিরাট পুরুষ হইয়া রহিলেন। তাঁহার বিপুল প্রতিভার সুবর্ণমুষ্টি ভিক্ষা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। তবু তাঁর দুর্লভ কলাপ্রতিভাকে আমি অভিনন্দন করি।

• ভারতবর্ষ; শ্রাবণ ১৩৩৫
(লেখাটির পুনঃমুদ্রণের সময় বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে)

[লেখক পরিচিতি : শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা রবীন্দ্রযুগের এক বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যসাধক। ১০ জানুয়ারি ১৮৮২ (বাংলা ২৭ পৌষ ১২৮৮) উ. কলকাতার সিমুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অবতারচন্দ্র লাহাও (১৮৮৫-১৯৩১) ছিলেন সে সময়ের সুপরিচিত কবি, গীতিকার, এছাড়া বঙ্কিমযুগে সাময়িক পত্রিকাতে গল্পও লিখেছেন। মেধাবী ছাত্র শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ১৮৯৮-তে এন্ট্রান্স ও ১৯০০-তে এফ এ পাশ করে ইংরাজিতে বি এ পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ (১৯০৩) ও বি এল (১৯০৪) ডিগ্রি লাভ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যুক্ত হন। পরে স্থানীয় কেশব একাডেমিতে ইংরাজি শিক্ষকতা করেন। কিন্তু উভয় বৃত্তিই ফাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। সাহিত্যের নেশায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি সুবিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় সহসম্পাদক রূপে যোগ দেন এবং আমৃত্যু সেখানে যুক্ত ছিলেন। ছোটো কবিতা, সাহিত্য ও শিল্পী বিষয়ক প্রবন্ধ ও অনুবাদ সাহিত্যে পারদর্শী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের নানা লেখা 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'মডার্ন রিভিউ', 'বসুমতী' ইত্যাদি নানা পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে যা এখনও গ্রন্থবদ্ধ হয় নি। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর সহসম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেও 'ছোটগল্প', 'তন্ত্র ও তন্ত্রী' প্রভৃতি কম নামি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। 'রবিবাসর' সাহিত্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। কিছুকাল এর সম্পাদকও ছিলেন (১৩৪২-৪৬)। ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসম্পাদক। ১৩৫৯-৬০ দু-বছর ছিলেন পরিষৎ-এর পত্রিকাধক্ষ্য। ১৪নং পার্শীবাগান লেনে উৎকেন্দ্র সমিতির আড্ডায় তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেনের ঘনিষ্ঠ পরিচিত। যতীন্দ্রকুমার যখন পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট'এর নাটকের নাট্যরূপ দেন এবং সমিতির সদস্যরা তা মঞ্চাভিনয় করেন সে অভিনয়ে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণও অংশ নেন। উৎকেন্দ্রিক সমিতির আড্ডা নিয়ে তিনি চমৎকার লেখাও লিখেছিলেন। ১৬ আগস্ট ১৯৬০ এই উদার সাহিত্যপ্রাণ, বন্ধুবৎসল ও অজাতশত্রু মানুষটির জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর পরও একাধিক পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছিল।]

অশোককুমার রায়

স্মৃতিকথায়
যতীন্দ্রকুমার সেন
- উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যায় রঙিন প্রচ্ছদ সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারু রায় অঙ্কিত করেছিলেন। প্রচ্ছদটি অলঙ্কার শিল্পের একটি মনোরম নিদর্শনরূপে সকল শ্রেণীর নিকট হতে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। 'বিচিত্রা'র নামের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে শিল্পী চিত্র পরিকল্পনার মধ্যে বিচিত্র রঙ ও রূপের সমাবেশ করেছিলেন।

পরবর্তী প্রচ্ছদ খ্যাতনামা চিত্রকর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনকে দিয়ে প্রস্তুত করবার প্রস্তাব উঠল। একটি মোটা অঙ্কের দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমলবাবু যতীন্দ্রবাবুকে উক্ত কার্যে ব্রতী করিয়ে এলেন। কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন অমলবাবু আমাকে নিয়ে পার্শিবাগান লেনে উপস্থিত হলেন।

পার্শিবাগান লেনের ১৪ নং বাড়ি পার্শিবাগানের সুবিখ্যাত বসু-বংশের গৃহ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কথাশিল্পী ও অভিধানকার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এবং জগৎবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ ও মনোবিকারের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এই বংশের সন্তান। যে সময়ের কথা বলছি, তখন রাজশেখরবাবু বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাস ওয়ার্কসের কারখানায় তাঁর খাস কোয়ার্টার্সে বসবাস করতেন। শনি-রবিবারে তিনি বাড়ি আসতেন এবং সময়ে সময়ে এক-আধ দিন তথায় অবস্থান করতেন। গিরীন্দ্রশেখর, কৃষ্ণশেখর প্রভৃতি অন্যান্য ভাই পার্শিবাগানের গৃহে বাস করতেন।

১৪ নং পার্শিবাগানে আমরা উপস্থিত হলাম; তার কারণ ঐখানেই শিল্পী যতীন্দ্রকুমারের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ ছিল। দিবসের অনেকখানি সময়েই তিনি ঐ গৃহে যাপন করতেন, এবং আমার বিশ্বাস, ছবি আঁকার অনেক কিছু কাজকর্মও ঐ গৃহেই চালাতেন - আড্ডা জমাতেন।

আড্ডা দেওয়াকে চিরদিন জীবনের একটা সুমিষ্ট বিলাস বলে বিবেচনা করে এসেছি; জাত আড্ডাবাজ আমি, গন্ধের দ্বারা আড্ডার অস্তিত্ব টের পাই। চোদ্দ নম্বর একটি যে সরেস দরের আড্ডাপীঠ, তা সেখানে প্রবেশ মাত্রই বুঝতে পারলাম। বেশি দিন সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয় নি, বোধ হয় দিন তিনেকের বেশি হবে না; কিন্তু তাতেই মালুম হয়ে গিয়েছিল। মুর্তি যে দেখতে জানে, সে দ্বিতীয় দিনের অপেক্ষায় রাখে না, প্রথম দিনেই দেখিয়ে দেয়। চোদ্দ নম্বরের আড্ডাপীঠ মামুলি আড্ডার পীঠ নয়। তার আড্ডার আবহাওয়া সাহিত্যের সৌরকরের দ্বারা উদ্ভাসিত, শিল্পের বায়ুপ্রবাহের দ্বারা হিল্লোলিত। রাজশেখরবাবুর কৌতুকরস-সরস সাহিত্য এবং যতীন্দ্রকুমারের সেই সাহিত্যের অপরূপ রেখানুবর্তন এই আড্ডার রাগ ও ছন্দ।

বসু-পরিবারের সহিত, বিশেষত রাজশেখর বসুর সহিত, যতীন্দ্রকুমারের বন্ধুত্ব যেমন সুদৃঢ় তেমনি সুচিরস্থায়ী। রাজশেখরবাবু গল্প রচনা করতেন, যতীন্দ্রবাবু সযত্নে ছবি এঁকে এঁকে সেই গল্পকে চিত্রিত করতেন। বোধ করি, এই কথা ও চিত্রের জড়াজড়ির প্রভাবেই তাঁদের মনের জড়াজড়িও এতটা দৃঢ় হতে পেরেছে। বহুদিন হতে রাজশেখরবাবু ভবানীপুরে বকুলবাগান রোডে গৃহ নির্মিত করে বাস করছেন, যতীন্দ্রবাবু বাস করেন সুদূর বেলগাছিয়া অঞ্চলে; কিন্তু এ দীর্ঘ ব্যবধান এ পর্যন্ত উভয়কে শুধু মনেই নয়, দেহেও বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, - এখনও উভয়ের দেখা হয়।

গত ৫-৪-১৯৫২ তারিখে বহুদিন পরে শ্রীযুক্ত রাজশেখরবাবুর সহিত দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন অপরাহ্নকাল, বেলা সাড়ে চারটের কাছাকাছি হবে। সঙ্গে ছিল আমার কনিষ্ঠ পুত্র কমলকুমার। গেট পেরিয়ে উভয় বারান্দায় গিয়ে দেখি, এক প্রান্তে শয়ন করে একটি বালকভৃত্য সুখে নিদ্রা দিচ্ছে। তার নাসিকাধ্বনির নিয়ন্ত্রিত উত্থান-পতন লক্ষ্য করে বুঝলাম, নিদ্রা তখনও প্রগাঢ়। ঘুম ভাঙতে মায়া হল, কিন্তু উপায়ওতো নেই। ক্ষণকাল ডাকাডাকির পর জাগ্রত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চান?'

বললাম, 'বাবু আছেন?'

"আছেন।"

"কোথায়?"

"ওপরে।"

বললাম, 'তাঁকে খবর দাও। বল, উপেনবাবু এসেছেন।"

বৈঠকখানা ঘরে আমাদিগকে বসতে বলে ভৃত্য দ্বিতলে খবর দিতে গেল।

বাইরের উজ্জ্বল আলোকধারা থেকে দোর-জানালা-বন্ধ-করা স্তিমিতালোকে কক্ষে প্রবেশ করে প্রথমটা সব জিনিষ ঠাহর হচ্ছিল না। তথাপি বুঝতে পারলাম, প্রশস্ত ফরাশের, উপর এক ভদ্রলোক শয়ন করে ছিলেন। আমাদের দুজনকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। পা ঝুলিয়ে ফরাশের ধারে উপবেশন করলাম। বাধ্য হলাম ভদ্রলোককে পিছন দিকে রাখতে।

পরমুহূর্তেই পেছুন দিক থেকে প্রশ্ন এল, "উপেনবাবু না?"

তাড়াতাড়ি জুতা খুলে সামনে হয়ে ফরাশের উপর উঠে বসে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি উপেন।"

"আমাকে চিনতে পারলেন না?"

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "আলো থেকে অন্ধকারে এসেছি, ঠিক বুঝতে পারছি নে। তা ছাড়া, দৃষ্টি ক্ষীণ।"

উল্লসিত হয়ে উঠলাম। রামের সঙ্গে দেখা করতে এসে লক্ষ্মণের দেখা পাওয়া গেল! এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে বললাম, "কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কেমন করে যতীনবাবু? বহুদিন তো আপনি আমাকে দেখেন নি?"

যতীনবাবু বললেন, "কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে আপনার ছবি দেখেছি। তার পর দেখি অনেকটা সেই ছবির মূর্তি ধারণ করে একটি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকছেন। তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, এ আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।"

আমরা যে চক্ষে ছবি দেখি, তাতে ভুলতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। চিত্রকরদের চক্ষে কিন্তু ছবি বাঁধা পড়ে এমন বন্ধনে, যা থেকে মুক্তি লাভ করা সহজ নয়।

গেঞ্জি গায়ে রাজশেখরবাবুর বৈঠকখানায় যতীন্দ্রবাবু দিব্য আরামে নিদ্রা যাচ্ছিলেন দেখে মনে হল, কাছাকাছি কোথাও তিনি বাস করেন। ভাবখানা এমনই যে, ঐ বাড়িতেই বাস করেন শুনলেও বোধ হয় খুব বেশি বিস্মিত হবার কারণ হত না। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় থাকেন যতীনবাবু? কাছাকাছিই বোধ হয়?"

হাসিমুখে যতীনবাবু বললেন, "আজ্ঞে না, আমি থাকি বেলগাছিয়া অঞ্চলে। প্রত্যহ বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার সময় এখানে আসি; সন্ধ্যায় ফিরে যাই।"

বললাম, "এতখানি আসতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয় খুব?"

মৃদু হেসে যতীনবাবু বললেন, "তা একটু হয়, সেইজন্যে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিই।"

একটি সংস্কৃত শ্লোক পড়ছিলাম - আকাশে মেঘ থাকে, পৃথিবীতে ময়ূর; লক্ষ যোজন দূরে ভানু থাকে, সরোবরে পদ্ম বহু যোজন দূরবর্তী হয়েও ইন্দু কুমুদের বন্ধু; সুতরাং 'যো যস্য হৃদ্যো ন হি তস্য দূরঃ,' - যে যার হৃদ্য, সে তার থেকে দূর নয়। এ কথা সত্য, তা স্বীকার করি। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করতে পারি নে যে, লক্ষ যোজন দূরে নিজের কক্ষে কায়েম থেকে পদ্মের দল বিকশিত করে সূর্য হৃদ্যতার যে-পরিমাণ পরিচয় দেন, গাড়ি-ঘোড়া-লরি-মোটর-সমাকীর্ণ কলিকাতার মাইল আষ্টেক বিপদসঙ্কুল পথ ট্রামে-বাসে অতিক্রম করে প্রত্যহ বন্ধুগৃহে উপস্থিত হয়ে যতীনবাবু তার চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণের পরিচয়ই দিয়ে থাকেন।

এই দুটি প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পী ও চিত্রশিল্পীর পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতার অপূর্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করে আমার স্মৃতিকথার একটি পাতা স্নিগ্ধ করে রাখলাম।

রাজশেখরবাবু উপর থেকে নীচে এসে বসতেই আমাদের তিনজনের বৈঠক জমে উঠল। রাজশেখরবাবু মিতভাষী, মৃদুভাষী, কথা বলেন অল্প, কথায় কথায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন না, শোনেন বেশি বলেন কম, কিন্তু যেটুকু বলেন তার আন্তরিকতা এবং অভিনবত্বের গুণে কথোপকথন সরস হয়ে ওঠে। যেমন হয়ে থাকে, নানা বিষয় আশ্রয় করে আমাদের কথা অগ্রসর হয়ে চলল।

কিন্তু স্মৃতিকথার সীমান্তরেখা অতিক্রম করে আমি অতর্কিতে হালের কথা বলতে আরম্ভ করেছি। সুতরাং যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, তাইতে ফিরে যাই।

অমলবাবুর সঙ্গে প্রথম যে দিন ১৪ নং পার্শিবাগান লেনে যাই, সেদিন তথায় কয়েক ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। দুজন ভিন্ন আর কারো নাম মনে পড়ে না - এক শিল্পী যতীন্দ্রকুমার, অপর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু। 'বাঁশরী' পত্রের সম্পাদক সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথের সহিত অমলবাবু আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেদিন যে পরিচয়ের সূত্রপাত, কালক্রমে তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়ার ফলে আজ নরেন্দ্রনাথ আমার অনুজ সমান হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

১৯২৮ সালে জুলাই মাসে 'উৎকেন্দ্রিক সমিতি'র দ্বাত্রিংশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরি হলে রাজশেখরের 'চিকিৎসা-সংকট' কৌতুক-নাট্য অভিনীত হয়। যতদূর মনে পড়ে, সে সময় উক্ত নাটকের মহলা এবং অন্যান্য তোড়জোড় চলছিল। আমি ও অমলবাবু যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন বোধ হয় ও বিষয়েই আলোচনা চলছিল। অভিনয়ের পরিচালনা ব্যাপারে যতীন্দ্রকুমার ছিলেন কর্ণধার। প্রহসনে ধনাঢ্য যুবক নন্দদুলাল মিত্রের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল নরেন্দ্রনাথ বসু। অভিনয়-দিবসে অভিনয় দেখবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল এবং প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। দীর্ঘ চতুর্বিংশ বৎসরের কথা হল, কিন্তু সেদিন ঘণ্টা দেড়েক-দুই যে অপরূপ আনন্দ উপভোগ করেছিলাম, তার স্মৃতির সৌরভ এখনও মনের মধ্যে বর্তমান আছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'team work', বাংলায় যার প্রতিশব্দ করা যেতে পারে দল-নির্বহন, অভিনয়ের সর্বত্র পরিপূর্ণভাবে তার অস্তিত্ব দেখা গিয়েছিল। কঠোর কর্ণধার যতীন্দ্রকুমারের দয়া-মমতাবর্জিত নিরবসর মহলাকার্য পরিচালনার ফলেই তা হতে পেরেছিল।

বিচিত্রার প্রচ্ছদ অঙ্কনের কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের দৃষ্টির সামনে যতীন্দ্রকুমার যখন সেটি মেলে ধরলেন, রঙ ও রেখার বিচিত্র লীলা দেখে আমাদের চক্ষু উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আশ্বিন মাস থেকে বিচিত্রার সেই প্রচ্ছদটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল। বাংলা মাসিকের প্রচ্ছদের ইতিহাসে বিচিত্রার সেই অপরূপ প্রচ্ছদটি একটি আদর্শ হয়ে আছে। আজ পর্যন্ত বোধ করি সে প্রচ্ছদটি অপরাজিত।

যতীন্দ্রকুমারের চিত্র-প্রতিভার উপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আস্থা ছিল। ঘটনাক্রমে আমরা একদিন সে কথা জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চিত্রিত করে বিচিত্রায় প্রকাশিত করবার উচ্চভিলাষ হঠাৎ একদিন আমাদের পেয়ে বসল। বাংলা দেশে এবং বাংলা সাহিত্যে তা হলে একটা অভূতপূর্ব কাণ্ড দেখানো যেতে পারে। কথাটা একদিন সাহস করে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে উত্থাপিত করলাম। প্রস্তাব শুনে কবি ক্ষণকাল চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "যতীন যদি এ কাজের ভার গ্রহণ করে, তা হলে আমি সম্মত আর নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

আশাতীত সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে আমরা কথাটা যতীন্দ্রবাবুকে জানালাম। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে যতীন্দ্রকুমার কিন্তু শিউরে উঠে বললেন, "বাপ রে। এত বড় বিশ্বাসকে আমি কখনো বিপন্ন হবার উপায় করে দিতে পারি! ও-কার্য আমার দ্বারা হবে না।"

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের সাক্ষাৎকার ঘটানো হল। যতীন্দ্রকুমার বললেন, তিনি ছবি আঁকতে একমাত্র এই শর্তে সম্মত হতে পারেন যে, কবির সঙ্গে পরামর্শ করে পরিবর্তিত করতে করতে ছবিগুলো যখন রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মনের মতো হবে, তখনই শুধু সেগুলি প্রকাশিত করা চলবে; অন্যথা প্রকাশ করা চলবে না।

এ কথায় রবীন্দ্রনাথ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, তিনি শুধু শিল্পীই মনোনীত করতে পারেন; চিত্র মনোনয়নের কার্যে চিত্রকরের অধিকার নিরঙ্কুশ।

অগত্যা হতাশ হতে হল। আমাদের অভিলাষ সফল হতে পারল না।

পটভূমিকা ও লেখক :

[উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যিক, সম্পাদক ও নাট্যকার। সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল। উপেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

১৩৩৪ সালের ১লা আষাঢ় প্রখ্যাত বাঙলা সাহিত্য পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়, উপেন্দ্রনাথ ছিলেন তার সম্পাদক। রেখায় লেখায় কি ভাবে পত্রিকাটি অনন্য সাধারণ করে তোলা যায়, সেই উদ্যোগে তাঁর সমস্ত অধ্যবসায় নিয়োজিত হয়েছিল। 'বিচিত্রা'র সূত্র থেকেই তাঁর স্মৃতি কথায় যতীন্দ্রকুমার সেনের জীবন চর্যার একখানি মনোরম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য লেখক প্রণীত "স্মৃতিকথা"র ৪র্থ ও শেষ খণ্ড থেকে এই অধ্যায়টি সংগৃহীত। লেখার মুদ্রণকাল আশ্বিন - ১৩৫৯।]

চোদ্দ নম্বর
ও
যতীন্দ্রকুমার সেন

গোপাল হালদার

'১৪ নং পার্শিবাগান' এখন ভিন্ন নম্বর, গোটা বাড়িটা বিভক্ত; 'উৎকেন্দ্রিক' নামও বিলুপ্ত। এক সময়ে '১৪ নং' ও 'উৎকেন্দ্রিক' সমার্থক না হোক কলকাতার সুধী সমাজে প্রায় সমোল্লেখিত হত। অথবা 'উৎকেন্দ্রিক' নাম অপেক্ষা '১৪ নং'- এর আড্ডা বলেই পরিচয় ছিল প্রচলিত। ভাগ্যবান বসু ভ্রাতাদের তা পৈতৃক ভবন—পিতা চন্দ্রশেখর বসু বোধহয় এই বাড়ি নির্মাণ করে দ্বারভাঙা থেকে এখানে বাস করতে আসেন। 'বড়দা' শশিশেখর বসু, 'মেজদা' রাজশেখর বসু, তৃতীয় কৃষ্ণশেখর বসু এবং কনিষ্ঠ ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু—এই চার ভ্রাতার বাসভবন। একমাত্র কৃষ্ণশেখর বসু বোধ হয় লেখায় হাত দেননি - সরকারি কাজ ছাড়া, এই স্বল্পভাষী মানুষটি হাত দিয়েছিলেন পল্লিসংস্কারে, তাঁর সে চেষ্টায় পূর্বপুরুষের গ্রাম উলা নবজন্ম পেয়েছে 'বীরনগরে'। অন্য ভ্রাতাদের নাম বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচিত।

১৪ নং পার্শিবাগানে আড্ডা শুধু সাহিত্যের নয়, তৎকালীন বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের এক প্রেরণাক্ষেত্র ছিল। ক্লাব ইংরেজদের জাতীয় জীবনধারার অঙ্গ, ইংরেজি সাহিত্যেরও পৃষ্ঠভূমি—অন্তত সেই 'মারমেড্ টেভার্নে'র যুগ থেকে তার ঐতিহ্য অবিচ্ছিন্ন। কালের নিয়মে আমরাও এদেশে ক্লাব গড়তে যাই, কিন্তু তা জমে না। 'রবিবাসরে'র মতো সভা কখনো জেগে বসে, কখনো ঝিমোয়। আমাদের সমাজে জমে যা সে 'আড্ডা'—সে গ্রামে হোক, শহরে হোক, চণ্ডীমণ্ডপে হোক, সাময়িক পত্রের আপিসে হোক, কিংবা হোক রাজনৈতিক দলের দপ্তরে বা পাড়ার কোনো সম্পন্ন সামাজিক মানুষের বৈঠকখানায়। কেউ তা গড়তে পারে না, তা গড়ে ওঠে আপনার নিয়মে—কেউ তার হিসেবও রাখে না। বাঙালির বৈশিষ্ট্য আড্ডা এবং বাঙালির তাসে দুরারোগ্য ব্যাধি। বাঙালির সংস্কৃতির যাত্রা, কবিগান, তরজা বা থিয়েটারের মতোই 'আড্ডা তার একটি ইন্সটিটিউশন'। আমি একটা লঘুরচনা লিখেছিলাম মধ্য চল্লিশে—যুদ্ধের মধ্যভাগে—আর 'আড্ডা' নামে একটা বইও লিখে ফেলেছিলাম তখন। '১৪ নং পার্শিবাগান'-এর উল্লেখ তাতেও আছে। উল্লেখই আছে, কিন্তু কথা নেই। উল্লেখ ছিল তখনকার জলজ্যান্ত 'প্রবাসী'র আড্ডা, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডারও—যে সময়কার কথা (১৯২০-১৯৩০) কেউ ঠিক লেখেননি।

'১৪ নং পার্শিবাগান'-র সেই আড্ডা সত্যিই তখন কীভাবে গড়ে উঠেছিল আমি তা জানি না, জানবার কথাও নয়। জানে, এমন লোক আজ বোধহয় কেউ নেই। কিন্তু 'পরশুরাম-এর সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই ১৪ নং পার্শিবাগানে 'উৎকেন্দ্রিক ক্লাব' গড়ে উঠেছিল, আমার তা স্থির বিশ্বাস। অর্থাৎ, অন্তত ১৯১৯-২০-রও বেশ আগে। আব, শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন বোধহয় তার কান্ডারি। ১৯২০-২৪-এও আমরা দেখেছি তিনিই তার চায়ের ভাণ্ডারী। আমি অবশ্য তখনো 'রঙ্গীনবাবুর ভাই'—'সঙ্গে এসেছি' রূপেই সস্নেহ সঙ্গলাভে ধন্য। চায়ের যে ভাণ্ডারী, আড্ডার সে-ই কান্ডারি—এই স্বাভাবিক নিয়ম। ১৪ নং-এর ফটক দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় উঠলে—সামনে ডা. বসুর চিকিৎসা-গৃহ, ডাইনে উপরে যাবার সিঁড়ি, বামে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ঘর-জোড়া তক্তপোষের ওপর শতরঞ্জি, সাদা চাদর বিছানো দিশি ফরাস। কলকাতার অবস্থাপন্ন বাঙালি ভদ্রলোকের গৃহে আজ কি আর 'বৈঠকখানা' আছে? না, তা পালন করা সম্ভব? সম্ভব হলে আজ নিশ্চয় বৈঠকখানাও সোফায়-সেটিতে 'ড্রয়িং রুম' হয়ে গিয়েছে, সেই ঢালা ফরাস, ঢালা গল্প আড্ডা শুদ্ধ বৈঠকখানা এখন লোকান্তরিত। ১৪ নং-এর সেই বৈঠকখানায় দুপুরের পর থেকে অপরাহ্নের দিকে যেমন খুশি আসবেন সেখানকার বন্ধু-গোষ্ঠী—যতীন্দ্রকুমার পূর্বেই এসেছেন। প্রায়ই তারপরে আসবেন 'ভারতবর্ষ' আপিসে যাবার পূর্বে সম্পাদক জলধর সেন। আরও একটু পরে—মধ্যাহ্ন তখন নিস্তেজ—'বড়দা' শশিশেখরবাবু, পাড়ার দু-একজন শিক্ষিত লোক, 'প্রবাসী'র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, পার্শ্বের বিজ্ঞান কলেজের কোনো অধ্যাপক বা বসুবিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যবয়স্ক গবেষক, বেঙ্গল কেমিক্যালের শহুরে আপিসের ফেরতা তার ম্যানেজার রাজশেখর বসু, রোগী দেখবার অবকাশে ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু, তাঁর বন্ধু ডা. সত্য রায়, কিংবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচটা না বাজতেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, মাঝে মধ্যে তাঁদের 'প্রবাসী'র সহকর্মীরা ও সজনী দাস, অশোকবাবু প্রভৃতি, আর নিজ নিজ আপিস শেষে আরও দু-একজন নিষ্কর্মা বাঙালি ভদ্রলোক একে একে আসবেন। সহজ ভাবেই আসত শিল্পীরা, কবিরা, সাহিত্যিকরা, বিজ্ঞানের অধ্যাপকরা এবং তাদের মিত্রবদাচরিত ছাত্ররা, আরও কত কে। জুতো ছেড়ে ফরাসে উঠে বসতেন, তাকিয়াও এক-আধজন আশ্রয় করতেন, ইচ্ছা হলে তর্কে যোগ দেবেন, সিগারেট খেলে যতীনদা এগিয়ে দিতেন।

শিল্পী যতীন্দ্রকুমার

যতীন্দ্রকুমার সেন সে-সময়কার কমার্সিয়াল আর্টিস্ট। সেদিকেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না, উঁচু দরের শিল্পী, যথার্থ কমার্সিয়ালও নন। অর্থার্জনেও যতীনদার আগ্রহ ছিল সীমাবদ্ধ। বাঁধা চাকরি অগ্রাহ্য, স্বাধীন বৃত্তির শিল্পী। অবশ্য একটি বাঁধা গ্রাহক ছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল, রাজশেখর বসু যার ম্যানেজার। এখনো বেঙ্গল কেমিক্যালের কোনো কোনো পুরোনো বিজ্ঞাপন চোখ জুড়োয়; দেখেই বোঝা যায়, কার কাজ। অবশ্য কার, তা আজ কজনা জানে? যতীনদার নিজস্ব ছাপ বা স্টাইল তারা চেনে না। তাঁর অনেক অসামান্য কৃতিত্বও তাই বিস্মৃত, হয়তো বা বিনষ্ট। আমাদের মাসিক পত্রে সেদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন ছিল সবচেয়ে রুচি-সার্থক ছবির বিজ্ঞাপন। তাদের আগে 'কুন্তলীন'-এর এচ্. বোস সে দিকে পদার্পণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯২০-র দিককার বাংলা মাসিক পত্রগুলিতে, বিশেষ করে তার শারদীয়াতে, বেঙ্গল কেমিক্যালের সচিত্র বিজ্ঞাপনী ফর্মা মুদ্রিত ও গ্রথিত হত। পূজার ছবি ও লেখার থেকে সেই বিজ্ঞাপনী চিত্র বেশি আকর্ষণীয় ছিল, এ কথা কয়জনা জানেন? কেউ কি সেই বিজ্ঞাপনী চিত্র রক্ষা করেছেন?

প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রা, অজন্তা বা বাঘের গুহাচিত্র থেকে যেন জীইয়ে উঠছে বাঙালি তরুণীর বেণী-রচনা ও কেশ-বিন্যাস। 'এখন যাঁরা বর্তমান আছেন মর্ত্যধামে' তাঁরাও যেন সেই বর্তমানের বঙ্গদেশে কালিদাসের কালকে জীইয়ে তুলছেন অন্তত শিল্পীর শিল্পরেখার দৌলতে। নব্য ভারতীয় শিল্পকে বিজ্ঞাপন শিল্পের স্থূলতা বাঁচিয়ে যতীন্দ্রকুমার সেন অপূর্ব সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন প্রচারশিল্পে; সে তাঁর এক অভিনব কৃতিত্ব। তাঁর আরেক কৃতিত্ব তাঁর ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন। প্রধানত সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র। আপন খুশিতে তিনি তা আঁকতেন। অনেকটা আবার তা ইলাস্ট্রেশন। পরশুরামের 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলি', প্রভৃতিতে যতীন সেনের ব্যঙ্গচিত্র এখনো লেখাকে রেখায় সরসতা দিচ্ছে। এরূপ ব্যঙ্গচিত্রে গগনেন্দ্রনাথের পরে তিনি ছিলেন প্রধান। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় তখনি খ্যাত। যতীনদা পরবর্তী কার্টুনিস্টদের অনেকের পথপ্রদর্শক। চারু রায় ও দীনেশ দাস (কল্লোলের) তাঁর সমকালীন। হরিপদ রায়কে আমি প্রথম দেখি '১৪ নং পার্শিবাগানে', তাঁর স্কেচে যতীনদার সাহায্য ও পরামর্শ নিচ্ছেন হাতে-কলমে। হরিপদ রায় ক্রমে 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় বাঁধা কার্টুনিস্ট হন, যতীনদাও খুশি মতো 'চিঠি'র শৌখিন জোগানদার। আমার ফেণী কলেজের সহকর্মী ইতিহাসের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীও ('পি সি এল' 'কাফী খাঁ') পরে এসে তাঁদের সঙ্গে 'চিঠি'তে যোগ দেন। পরে তাঁকে একালের 'দৈনিক-কর্তারা' লুফে নেন, এবং শুষে নেন। যতীন সেনের জন্যই ১৪ নং ছিল 'শিল্পপীঠ'। যতীন সেনকেই তাই বলা চলে ১৪ নং-এর কান্ডারি। 'উৎকেন্দ্রিক' নামকরণটাও বোধহয় তাঁরই উদ্ভাবিত, অথবা আহৃত। অন্তত শব্দটা তাঁর মন ও মেজাজের যথার্থ পরিচায়ক। তাঁর নিজের এবং সমবেতভাবে '১৪ নং'-এরও।

একটা মজার কথা মনে পড়ছে—'বিচিত্রা' তখন প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আগমনী; বাজার গরম গল্প-গুজবে। তার প্রথম প্রচ্ছদপট আঁকছেন যতীন সেন—সাত রঙের সাতটি সূর্যরশ্মি মূর্ত হয়েছে নৃত্যপরা সাতটি নায়িকা রূপে—কী বলব তাদের, 'সপ্তরূপসী' না সপ্তরশ্মি? যা-ই বলি ''ইট উইল স্মেল অ্যাজ সুইট''। ভারতবর্ষএর সম্পাদক জলধরদা সিগার-মুখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যতীন, 'বিচিত্রা'র কী করছ?' যতীনদা আঁকতে আঁকতেই মুখ না তুলে সকৌতুক উত্তর দিলেন। জলধরদা কান দিয়ে শোনেন না, চোখ দিয়ে শোনেন। সেরূপে শুনেই অন্যদের স্মিতহাস্যে যোগদান করলেন। যারা কান দিয়ে শুনেছে তারা জানে উত্তরটি ছাপায় অচল, কিন্তু ১৪ নং-এর মেজাজে তার জলচল অবাধ।

১৪ নং-এর সে মেজাজ কীসে গড়ে উঠেছিল বলা সহজ নয়। সে আসরে কেউ প্রবীণ বয়স্ক, কেউ সদ্য-প্রাপ্তবয়স্ক, আসলে সবাই সমবয়স্ক। কথা উঠত হাজার বিষয়ের, কথায় কথায় যা উঠে পড়ে। কথা মানেই তর্ক, তাতেও অবাধ অধিকার সকলের। ধরাবাঁধা কিছু নয়, যাকে বলে নির্দিষ্ট আলোচনা, তা নয়। সেরূপ আলোচনাও দু-এক সময়ে না হত তা নয়। যেমন, ব্রজেন্দ্রনাথ বোধহয় উদ্যোগী হয়ে একদিন নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকারকে—তাঁর কাছ থেকে মুঘল যুগের কিছু কথা সকলে শুনবেন। কেউ এক-আধটি জিজ্ঞাসাও উপস্থিত করলেন। অবশ্য অন্য আলাপও হল। সভ্য সদালাপ। একবার দেখেছি নৃ-বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ বিরজাশঙ্কর গুহকে। সদ্য উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, এক রাশি ফটো দেখাচ্ছেন মায়া, য়িকুতা প্রভৃতি জাতির লুপ্ত সভ্যতার রূপ-মূর্তির মন্দির নগর। দু-একটি কথায় মাঝে মাঝে তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। স্বল্পভাষী মানুষ—আড্ডা জমাবার মতো নন। গিরীন্দ্রশেখরবাবু ও অন্য দু-একজন মাত্র আগ্রহী শ্রোতা, শুনতেও উৎসুক। কিছুটা আলাপও চলল। তখনো ওসব সভ্যতার কথা এ দেশে শিক্ষিতদেরও নিকট জনশ্রুতি। কিন্তু এ রকম ভব্য আলোচনা বেশি হলে ১৪ নং-এর মেজাজ সইত না। তবে মাঝে মাঝে জ্ঞান-বুদ্ধিতে এক-আধটুকু শাণ না দিলে শিক্ষিত বাঙালির মন তাকে খোঁচা দেয়। এক-আধ দিন চাই ওরূপ আলাপন। ১৪ নং-এ ওরকম আলাপন নৈমিত্তিক কর্ম। নিত্যকর্ম—আড্ডা, গল্প, কথা—কথা থেকে কথায় যা এগিয়ে যায়; তর্কের ছোটোখাটো ঢেউ তুলে দেয়। দৈনিক সংবাদ— রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, যে দিনকার যা

- উৎকেন্দ্র সমিতির আড্ডা

- স্বরচিত গল্পে শিল্পী অঙ্কিত কৌতুকচিত্র
  সচিত্র শিশির (১৯২৪)

খবর বা গুজব, তা কথা হয়ে ভেসে ওঠে, তারপর মিলিয়ে যায়। কিন্তু হাস্যপরিহাসের ছটা তার মাথায় ঝিক্‌মিক্ করে। তারই মাঝে মধ্যে ওরকম রসিকতার ক্ষণস্থায়ী ঝিলিক্—ছাপায় উপেক্ষিত হলেও সে-রসিকতা সকৌতুক সম্বর্ধনা পেত আড্ডায়। অবশ্য রুচির মাত্রা তাতেও একটা থাকত। ফ্রয়েডীয় অধ্যাপক ডাক্তার বসু ওরকম স্বচ্ছন্দ্য রঙ্গপরিহাসের সমর্থক। অবশ্য তাঁর নিজের মুখে অন্তরের প্রসন্ন হাসি ও অমায়িক কথা ছাড়া কিছু ফুটত না। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক মত এই—মুখের লাগামে এক-আধটুকু ঢিলে দেওয়া ভালো; সামাজিক বিধি-নিষেধের ফাঁস তাতে সহনীয় হয়। কারণ, লাইফ্, ইজ্ হার্ড টু এন্‌ডিওর। জীবনের চারদিকে সুনীতি -দুর্নীতির 'নিষেধ' ও কড়াকড়ি। ক্যাথার্সিস্ -এ দুঃখ সহনীয় হয়, বিধি-নিষেধের কড়াকড়িও হাল্কা হয়। '১৪ নং পার্শিবাগান' মানত না আসলে শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি । এই কৃত্রিম বেড়া ভাঙার কাজে রাখালদাস বাঁড়ুজ্জের সহজ খ্যাতি ছিল। কিন্তু কলকাতায় তাঁর তখন উপস্থিতি বিরল।

■লেখকের "রূপনারানের কূলে (২য় খণ্ড)" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত
•'পুঁথিপত্র', এপ্রিল ১৯৭৮

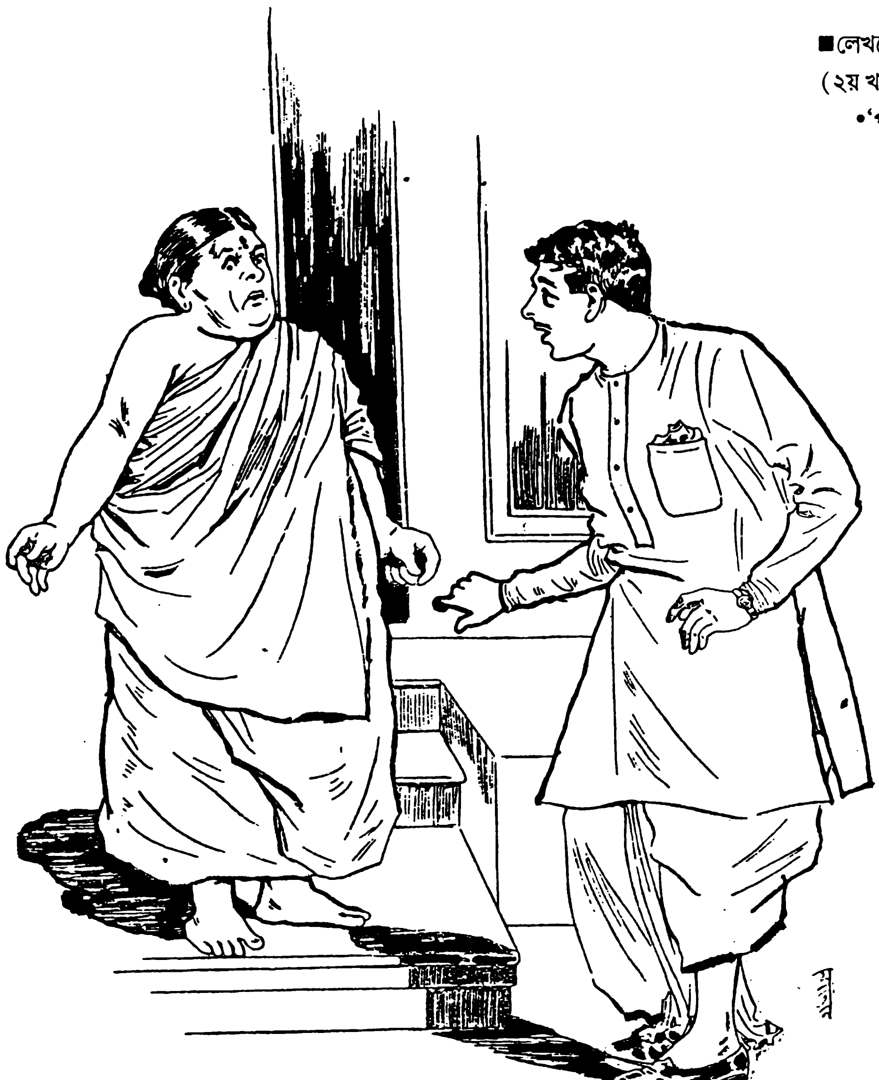

• ভারতবর্ষ পত্রিকায় শিল্পীর অলংকরণ

একটি স্মরণীয় দিন

পরিমল গোস্বামী

আজ যে অতি সামান্য ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি, তা বর্তমান মুহূর্তের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ঘটছে বলেই হয়তো তা সামান্য বোধ হচ্ছে। এই যে রচনাটি লিখছি, একটু দূরে ঘড়ি টিক টিক শব্দ করছে, বাইরে কাক ডাকছে, আজ ২১ মার্চের মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, এমন জিনিসের কি দাম আছে পৃথিবীর ইতিহাসে। মনে হয় না যে, কিছু আছে। কিন্তু আজ যদি এর বর্ণনা সম্পূর্ণ করে লিখে যেতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে এই আপাত তুচ্ছ জিনিসই হয়তো কোনো না কোনো ইতিহাসের উপাদান জোগাবে। চিরকাল তাই হয়ে আসছে।

আমি যে দিনটিকে আজ স্মরণীয় মনে করছি, তাও এই ভাবে যে, আজ তার কোনো দাম না থাকলেও, ভবিষ্যতে হয়তো তা আমার কল্পনারও অতীত কোনো একটা সত্য আবিষ্কারের সাহায্য করবে।

আমার কাছে ২২ জানুয়ারি (১৯৬০) স্মরণীয়। আমি ঐ দিনটিতে তীর্থযাত্রার পুণ্যলাভ করেছি। আমি পুণ্যলাভের জন্য রেলের টাইম-টেবল দেখে কখনো কোনো তীর্থস্থানে যাইনি। গিয়েছি মনের মানুষের কাছে, গিয়েছি প্রকৃতির রাজ্যে।

দুই-ই আমার কাছে মহাতীর্থ। যেখানে মনের আনন্দ সেই তো তীর্থ। যার যেমন বিশ্বাস। মনের মতো মানুষের সান্নিধ্যে এলে মনে বিস্ময় জাগে। তখন কোনো কিছুই আর তুচ্ছ মনে হয় না।

২২ জানুয়ারি ১৯৬০!

কিন্তু দিনটিকে স্মরণীয় বলছি কেন, তা বলতে হলে তার আগে একটুখানি ভূমিকা দরকার।

ঐ তারিখের কয়েকদিন আগে (১০ জানুয়ারি) 'যুগান্তর' সাময়িকী বিভাগে কয়েকটি বিষয়ে নববর্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। তার মধ্যে এই প্যারাগ্রাফ দুটিও ছিল :

"এ বছর (১০ জানুয়ারি ১৯৬০) শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুকে সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হবে। (এ ভবিষ্যদ্বাণী, আমি যে নিমন্ত্রণ-চিঠিখানা পেয়েছি, তা থেকে করছি।) দেশ তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে তাঁর প্রথম আবির্ভাব থেকেই। সে শ্রদ্ধার পরিমাণ কত, তা গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের বইয়ের খাতে তাঁর দেওয়া তাঁর ইনকাম-ট্যাক্সের পরিমাণ দেখা সম্ভব হলে জানা যাবে। তবে কিছুকাল হল একশ্রেণির সমালোচক তাঁর সম্পর্কে একটা মস্তবড়ো আবিষ্কার করে ফেলেছেন এই যে, তিনি আর আগের মতো লিখতে পারেন না।

এই আবিষ্কার অবশ্য মস্তবড়ো সত্যিই নয়। কারণ এর সঙ্গে আরও যোগ করা যেত—রাজশেখর বসু আগের মতো দৌড়াতে পারেন না, আগের মতো হাড় চিবোতে পারেন না—, এবং আরও কত কি। কিন্তু এই 'আগের মতো' মানে কী ... কোনো জিনিস চিরদিন একরকম থাকে না। পরিবর্তনই জীবনের লক্ষণ। ... মানুষ যে রসসৃষ্টি করে তা তার সজ্ঞান সৃষ্টি, তাই তার পরিবর্তন আছে। মানুষ যদি একটি ফজলি-আমের গাছ হত তাহলে সে গাছ বৃদ্ধত্বের চরমে পৌঁছেও মৃত্যুর আগে প্রায় ঠিক একই স্বাদের আম ফলিয়ে যেত।" ...

আরও কয়েকটি প্যারাগ্রাফ এর পরে ছিল, এবং তাতে আমি মূলত এই কথাটি বলেছিলাম যে, যদি বলি রাজশেখর বসু আগেই এখনকার মতো লিখতে পারতেন না, তাহলে কথাটি একই দাঁড়ায় নাকি? এবং এ বয়সেও তিনি অবিরাম যে রসসৃষ্টি করে চলেছেন তার তুলনা কোথায়?—ইত্যাদি।

এই হল ভূমিকা। আমি সেদিন ঐ ১০ জানুয়ারির সভায় যেতে পারিনি। স্বাস্থ্যের জন্য আমার চল্যাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সবই প্রায় নিয়ন্ত্রিত। তা ভিন্ন কোনোরকম উত্তেজনা এখন আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। এইসব বিবেচনায় কয়েকবছর হল হৈ-চৈ এড়িয়ে চলে আসছি। (তবে 'অ্যাগোরাফোবিয়া'তে এখনও আক্রান্ত হইনি।)

আমি সভয় যেতে পারব না জেনেই শ্রীরাজশেখর বসুকে একখানা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, "আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন আমি দূর থেকে 'যুগান্তর'-এর পাতাতেই করলাম।" আর লিখেছিলাম, "আপনি দীর্ঘজীবী, দীর্ঘতরজীবী, হোন এই কামনা করি।"

আমার চিঠির উত্তর অপেক্ষিত ছিল না, তবু এল উত্তর। তিনি জানালেন (১২-১-৬০):

"প্রীতিভাজনেষু, পরিমলবাবু, আপনার ৮ তারিখের চিঠি পেয়েছি। তুষারকান্তিবাবুর কাছে শুনেছি আপনি আমার সম্বন্ধে যুগান্তরে লিখেছেন। এখনও পড়তে পারিনি।...

"চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় মাসে একদিন এখানে আসেন। যদি আপনার অসুবিধে না হয় তবে একই গাড়িতে তিনি আর আপনি এখানে আসতে (আর ফিরে যেতে) পারেন। আমি চিঠি লিখে দিন স্থির করে আপনাকে জানাতে পারি। বেলা চারটে নাগাদ। আপনার সম্মতি পেলে সুখী হব।

দীর্ঘজীবী, দীর্ঘতরজীবী হবার আশীর্বাদ আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনি সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করুন। আমি চটপট নিষ্কৃতি চাই।" —আপনার রাজশেখর বসু

জানিয়ে দিলাম অবশ্য যাব। সে চিঠির উত্তর পেলাম ১৯ জানুয়ারি :

"প্রীতিভাজনেষু, আপনার ১৪/১-এর চিঠি। আগামী শুক্রবার ২২ জানুয়ারি বিকালে আন্দাজ পৌনে চারটের সময় আপনার কাছে গাড়ি যাবে। চারুবাবু থাকবেন। আশা করি আপনি এখন সুস্থ আছেন।" —আপনার রাজশেখর বসু

অবশেষে ২২ জানুয়ারি। আমরা বিকেল প্রায় সাড়ে চারটের সময় ৭২ বকুল বাগান রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে প্রায় তিন বছর দেখিনি, তাই বয়স-জাত রূপান্তরটা হঠাৎ চোখে একটু বেশ লেগেছিল গাড়িতে প্রথম উঠতে গিয়েই। যেমন লেগেছিল অনেকদিন পরে গতবছর শয্যালগ্নদেহী প্রেমাঙ্কুর আতর্থীকে দেখে। আমাকেও যাঁরা অনেকদিন পরে দেখেন, তাঁরা চমকে ওঠেন। জাগতিক পরিবর্তনের চাকায় আমরা সবাই নির্মমভাবে বাঁধা, এবং সেই তত্ত্বকথাটি গোড়াতেই সেরে রাখলাম।

কিন্তু চারুচন্দ্রকে বাইরে থেকে কিছু শীর্ণ মনে হলেও আমার চমক লাগা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। চমক লেগেছিল অন্য কারণে, এবং তাতে বিভ্রান্তি ছিল না। সে কথা পরে বলছি।

প্রায় পাঁচ বছর আগে একবার মাত্র গিয়েছিলুম ৭২ নম্বরের বাড়িতে — রাজশেখরের জ্যেষ্ঠ শশিশেখর আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন রাজশেখরের যে চেহারা দেখেছিলাম এখন তা থেকে কিছু স্বতন্ত্র মনে হল না। বরঞ্চ বেশ সুস্থই মনে হল। একটা বেশ খুশি ভাবও ছিল তার সঙ্গে। সম্ভবত চারুচন্দ্রের দেখা পেয়ে।

আমরা দোতলার বারান্দায় সবাই বসেছি। শুনলাম চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেনও আসবেন। কিন্তু কখন আসবেন সে বিষয়ে আমার কিছু উদ্বেগ ছিল। আমাদের সঙ্গে হিমানীশ দুটি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে একটি রঙীন ফিল্মযুক্ত মুভি-ক্যামেরা। যে ফিল্ম ছিল তাতে ছবি রোদে না তুললে চলবে না। জানুয়ারি ২২ তারিখে বেলা সাড়ে চারটের পর সে-বারান্দায় একটি কোণে মাত্র পলায়মান এক টুকরো রোদের শেষ আভাটি তখনও সম্পূর্ণ সরে যায়নি। তাতে একজনের মাত্র স্থান সঙ্কুলান হয়। অতএব আমরা পালা করে এক একজন সেই রোদের দিকে সরে আসতে লাগলাম।

যতীন্দ্রকুমার তখনও এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু ১৯৬০ সালের ২২ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটে এই বারান্দায় আরও অনেকখানি স্থান জুড়ে রোদের দরকার হবে, সে কথা বাড়ি তৈরির সময় কারো খেয়াল হয়নি এটি বড়োই দুঃখের বিষয়। খেয়াল রাখলে সবার প্রতি সুবিচার করা হত এবং যতীন্দ্রকুমার কয়েক মিনিট দেরিতে আসা সত্ত্বেও কোনো অসুবিধা হত না।

যতীন্দ্রকুমার সেনকে আমি আগে দেখিনি, প্রথম দেখলাম। আগে না দেখলেও আমাদের মধ্যে বরাবর একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে। রাজশেখরের প্রথম বইগুলিতে তাঁর আঁকা ছবি চমকপ্রদ লেগেছিল, এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম জেগেছিল মনে। শুনলাম তিনিও আমার ফোটোগ্রাফ অনেক মুখস্থ করে রেখেছেন, এবং একখানা রঙীন ছবি (ময়ূরের 'যুগান্তর' পূজাসংখ্যায় ছাপা) কেটে বাঁধিয়ে রেখেছেন, বললেন। এটি গুণীজনের বিশুদ্ধ উদারতা।

খুবই রসিক ব্যক্তি। অবশ্য এ কথাটা না বললেও চলত, কেননা সমধর্মী না হলে রাজশেখরের সঙ্গে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হবে কেন। সম্প্রতি তিনি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, চোখে ক্যাটারাক্ট হয়েছে, কাটাতে হবে এক বছর পরে। এই এক বছর তাঁর অন্ধকারে বাস। তবে সম্ভবত রাজশেখরের সান্নিধ্যে এলে তিনি আলো দেখতে পান, এবং আরও মজার কথা, রাজশেখরও তখন কানে শুনতে পান। আমি লক্ষ করে দেখলাম, যতীন্দ্রকুমার পাঁচ-ছ হাত দূরে বসে স্বাভাবিক কণ্ঠে যত কথা বললেন, রাজশেখর তা সবই শুনতে পেয়েছিলেন। তখন মনে হয়েছিল, কানে কম শোনার ব্যাপারটা একটা প্রতারণা।

উৎকৃষ্ট সব খাবার এসে গেল। তখন চারুচন্দ্র একটু যেন মাত্রাতিরিক্তরূপে সবাক হয়ে উঠলেন বলে মনে হল। নিজে থেকেই বয়সের কথা তুলে বললেন, আমি ৭৭, যতীন্দ্রকুমার ৭৮ আর রাজশেখর ৮০। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, [illegible]—শিশু।

শুনে কিঞ্চিৎ মনমরা হয়ে পড়লাম। আমি জানতাম, আর কিছু না থাক, আমার বয়সের গুরুত্বটুকু পাঁচজনকে শোনাবার মতো। আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি এজন্য। 'শিশু' সম্বোধনে সে প্রসাদ নষ্ট হয়ে গেল যেন।

চারুচন্দ্র আরও বললেন, তাঁর ৭৭ বছর বয়সেও সবগুলো দাঁত স্বস্থানে আছে, একটিও স্খলিত হয়নি। শুনে সে সময় একটি কথাও বলতে পারলাম না, কেননা আমার দুপাশের দুটি দাঁত নেই। সুতরাং নীরবে, তিনি ৩২টি দাঁতে, এবং আমি ৩০টি দাঁতে, সম্মুখস্থ খাদ্যবস্তু নিষ্পেষিত করতে লাগলাম। কয়েক বছর আগে 'যুগান্তর' পূজাসংখ্যার জন্য চারুচন্দ্র আমাকে আহার বিষয়ে একটি রচনা কেন দিয়েছিলেন, তা সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলাম।

বিজ্ঞানী চারুচন্দ্রও মহা রসিক ব্যক্তি, নইলে রাজশেখর বসুর সঙ্গে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের পারমাণবিক সম্পর্ক এমন গভীর হত না, স্থূল মানবিক সম্পর্ক বাদ দিয়ে। চারুচন্দ্রের কৌতুকপ্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করি। আমার 'সপ্তপঞ্চ' নামক বইতে পরীক্ষার খাতায় অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর সংগ্রহ করে একটি লেখা স্থান পেয়েছে। তার কয়েকটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করছি :

"একজন পরিচিত পেপার-সেটার আমাকে চমৎকার একগুচ্ছ হাউলার পাঠিয়েছিলেন। কয়েক বছর ধরে সেটি আমি সযত্নে রক্ষা করে আসছি। তিনি লিখেছেন: "এবার ম্যাট্রিকের সায়েন্সে আমারই একটি প্রশ্ন ছিল— মানবদেহে রক্ত-চলাচল-রীতি বর্ণনা কর—Describe the circulation of blood in the human body. একটি ছেলে এর উত্তরটা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু শেষে লিখেছে কিন্তু আজ সাম্প্রদায়িক যে অত্যাচার চলছে তাতে আমাদের রক্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত চলছে, ইচ্ছে হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে বেরোই। আমি আর থাকতে পারছি না, আমি এক কবিতা লিখি—'

"এরপর তিন পাতা কবিতা চলল। শেষে লিখেছে কবিতাটা আমি এখানেই রচনা করলুম। কি রকম হয়েছে, স্যার?

"উক্ত পেপার-সেটার আরও কয়েকটা হাউলার এই সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে কয়েকটা উপহার দিচ্ছি:

"সংস্কৃত থেকে অনুবাদ : বাতেন উদরং পূরয়িত্বা—filling the belly with gout ... রামের সুমতি গল্পে লিখেছে, 'রাম অনেকবার সুমতির পরিচয় দিয়েছে। দশরথ যখন তাকে বনে যেতে বলল সে কোনো প্রতিবাদ না করে গেল।'—ইত্যাদি।"

এই পেপার-সেটার স্বয়ং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি এটি পাঠিয়েছিলেন 'বিশ্বভারতী'র পুলিনবিহারী সেনের হাত দিয়ে। সে সময় 'যুগান্তর' সাময়িকীতে 'হাউলার' প্রকাশ হয়েছিল কিছু। চারুচন্দ্র ঐ হাউলারগুলি পাঠিয়ে পুলিনবিহারী সেনকে চিঠির এক কোণে লিখেছিলেন, 'পরিমল কি এগুলো ছাপবে?'

চিঠিখানা আজও আমার কাছে আছে। আমি ছেপেছিলাম, কিন্তু প্রেরকের নাম তখন প্রকাশ করা নিরাপদ ছিল না। এখন আর কোনো বাধা নেই।

প্রসঙ্গত অনেকখানি স্মৃতিকথা বলা হয়ে গেল, অতএব আবার ৭২-এ ফিরে যাওয়া যাক।

আমাদের আলাপের মাঝখানে শ্রীমান কাঞ্চনকান্তি বসু লঘু পায়ে এসে রাজশেখরের কোলে উঠে শান্তভাবে বসে রইল। প্রশ্রয় বেশি পেয়েছে বোঝা গেল।

রাজশেখর বললেন, কাঞ্চনকান্তি বসু আমার পোষ্য। বেশ পরিপুষ্ট দেহটি, ল্যাজটিও ভালোই। বললেন, ডজনখানেক আছে। একটির নাম উত্তমকুমার। কিন্তু সে আপন সন্তানকে উদরসাৎ করায়, নাম বদলে খোক্কস রাখা হয়েছে।

নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলছে, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্পর্ক নেই, সেজন্য আরও ভালো লাগছে।

তাঁর প্রথম লেখার কথা তুললাম। বললেন, "আগে যা সব লিখেছি, তা ছাপা হয়নি।" চারুচন্দ্র বললেন, "সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রথম ছাপা গল্প।" যতীন্দ্রকুমার যোগ করলেন, "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। এ গল্পের মূলে একটা ইতিহাস আছে।" বললেন, "যুগান্তরে এবারে যে দাঁড়কাগ বেরিয়েছে, সত্যিই একটি মেয়েকে দাঁড়কাগ বলা হত। স্কটিশ চার্চ কলেজের কাছাকাছি থাকত মেয়েটি, রং ছিল তার কালো।"

আমি রাজশেখরকে বললাম, "আপনি অনেককাল বিহারে কাটিয়েছেন, সেজন্য আপনার অনেক গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য

বেড়েছে।" বললেন, ১৮ বছর কাটিয়েছেন বিহারে। এই ব্যাপ্তিটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে বাড়ির সমান্তরাল বকুল বাগান রোড সোজা আর একটি রাস্তায় গিয়ে মিশে ৯০° কোণ সৃষ্টি করেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "ও পথটার কি নাম?" রাজশেখর বললেন, "ওটাও বকুল বাগান রোড। এখানে এ পথের অনেকগুলো ডালপালা আছে, বাড়ি খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়।" বললেন, "এই রাস্তাতেই বাড়ি করেছি তার মূলে একটি সেন্টিমেন্ট। বাবা কর্পোরেশনের কালেক্টার ছিলেন, তিনি ১০ নম্বর বকুল বাগান রোডে থাকতেন।" যতীন্দ্রকুমার বললেন, "এ পথে এমন ধাঁধা যে নিজেরই বাড়ি চিনে আসা শক্ত হয়। বাড়ি তৈরির সময় মিস্ত্রিরা যে ঝাঁটার ঝাণ্ডা বাঁধে, দূর থেকে সেই নিশানা ধরে এ বাড়িতে আসতে কতবার ভুল হয়েছে।"

পথের প্রসঙ্গে পথের নাম বদলের কথা উঠল। রাজশেখর বললেন, এই বদল তিনি আদৌ পছন্দ করেন না, বদলের মূলে কোনো যুক্তিই নেই।

আলাপ চলতে চলতে আমি সঙ্গের ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরায় রাজশেখরের ছবি তুলছিলাম। আমি পাশেই বসেছিলাম, এবং তিনি আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে আধ-বসা আধ-শোয়া অবস্থায় ছিলেন। ক্যামেরাটি টাটকা নতুন—আমার নয়, সরোজ আচার্য সদ্য জার্মানি থেকে এনেছে। ফোটো-ইলেকট্রিক সেলের এক্সপোজার মিটার বসানো। ক্যামেরাটি দেখে রাজশেখর বললেন, "আজকাল চমৎকার সব ক্যামেরা বেরিয়েছে, দেখলে আবার ক্যামেরা ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয়।" 'আবার', মানে, এ বিদ্যা তাঁর অজানা নয়। আগে তাঁর ক্যামেরা ছিল।

যতীন্দ্রকুমারের ক্যামেরায় স্মৃতি জেগে উঠল। আগে তিনি বড়ো ফিল্ড-ক্যামেরা ব্যবহার করতেন। ফিল্ড-ক্যামেরা আগে কে না ব্যবহার করেছে? ছোটো ক্যামেরার চলন এদেশে অনেক পরে হয়। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমত, ছোটো ছবি বড়ো করা তখন আজকের মতোন এমন সহজ ছিল না, এবং চিত্রধর্মী ফটোগ্রাফি তখন কল্পনার বাইরে ছিল। শুধু মানুষের ছবি তোলা, এবং তাও রামকে রাম বলে চিনতে পারাই তখন যথেষ্ট মনে করা হত। সমস্ত জিনিসটাই তখন সবার পক্ষে ছিল একটা গ্রাম্য বিস্ময়ে দেখবার বস্তু।

এইভাবে আমরা পরস্পর কিছুক্ষণ ক্যামেরা-স্মৃতি রোমন্থন করলাম। যতীন্দ্রকুমারের একটি মজার গল্প মনে পড়ল। তিনি এক যুবকের স্ত্রী-সমেত ফোটো তোলার অনুরোধ পেয়েছিলেন। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে শুনলেন বধূটির পরপুরুষের সামনে প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একমাত্র তার নিজস্ব পরম পুরুষটি ভিন্ন আর কাউকে সে মুখ দেখাবে না। অথচ ফোটোও তোলাতে হবে। ব্যবস্থা হল, যতীন্দ্রকুমার ক্যামেরার ফোকাসিং ক্লথ থেকে মাথা বার করতে পারবেন না, এবং ঐ কালো কাপড়ে মাথা ঢেকেই সব করতে হবে কিন্তু ওদিকে যে ফোকাসিং স্ক্রিনের উপর সমস্ত চেহারাটাই দেখা যাচ্ছে উক্ত পরম পুরুষের তা অজ্ঞাত ছিল। যতীন্দ্রকুমার ভালোমানুষ সেজে শুভকার্য সমাধা করলেন, সতীধর্ম সম্পূর্ণ রক্ষা পেল, পরপুরুষের দৃষ্টিতে যেসব বিপর্যয় ঘটতে পারত, সেসব আর ঘটবার সুযোগ পেল না।

আবার অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম। শুনলাম রাজশেখর আমার সেই 'যুগান্তর'-এর লেখাটি পড়বার সুযোগ পেয়েছেন। বললেন, "তাঁর কোনো আত্মীয় বলেছিলেন, সভায় ঐটি পড়লেই হত, আর কিছু করবার দরকার হত না।" বললেন, "আমার লেখার মধ্যে ভালো, মাঝারি, খারাপ, তিন-ই আছে।"

আমি বললাম, "কোনো একটি গল্প আর একটি গল্পের সঙ্গে তুলনা না করাই বোধ হয় ভালো, কারণ প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু আলাদা, তাই এক-একটা এক-এক রকম হয়। তবে পাঠকেরা বড়োই গোঁড়া। একবার যা ভালো লেগেছে, বার বার তাই চায়। অন্য রকম দিলে মনে করে ঠকাচ্ছে।"

রাজশেখর হেসে বললেন, "আমার লেখা হিন্দুস্থানীরা বোধ হয় বেশি পচ্ছন্দ করে। বই বেরোতে না বেরোতে হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করে।"

যতীন্দ্রকুমারকে আমি বললাম, "পরশুরাম যখন অজস্র লিখছেন সেই সময় আপনি চোখ খারাপ করে বসলেন। পরশুরামের লেখার সঙ্গে আপনার ছবি না থাকাটাও একশ্রেণির পাঠকদের পক্ষে হতাশার কারণ হয়েছে।"

যতীন্দ্রকুমারের ছবির প্রসঙ্গে কার্টুন ছবির কথা উঠল। রাজশেখর বললেন, "কার্টুন আমাদের দেশে ঠিক হয় না; কেউ বোঝেও না, এই হচ্ছে আরও বিপদ।"

আমি বললাম, ''বোঝে না, সত্যি কথা।''

স্টেটসম্যানের 'মুমিন' পর্যায়ের ছবিগুলোর কথা উঠল। আমি বললাম, ''এমন চমৎকার কৌতুক-ছবি আমি ইতিপূর্বে আর দেখিনি।''

রাজশেখর বললেন, ''ঐ ছবিগুলো আমি কেটে রাখি।''

কতখানি পছন্দ করেন বলা হয়ে গেল। শুনে বিস্মিত হলেন যে ঐ ছবিগুলো একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মহিলাশিল্পীর আঁকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রসঙ্গ ঘুরে গেল ১০ তারিখের সভার বিষয়ে। সেদিন কে এসেছিলেন, আসেননি — বলছিলেন। ''তুষারকান্তি ঘোষ দেরিতে এসেছিলেন।'' যতীন্দ্রকুমার বললেন, ''তাঁকে বলা হয়েছিল, তুষার গলতে একটু দেরি করেছে।'' রাজশেখর বলছিলেন, ''সজনিকান্ত আসেননি, কেদার চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ ছিলেন, আসতে পারেননি।'' উপহার প্রসঙ্গে বললেন, ''কত যে সব জিনিস দিয়েছি, সব দেখিওনি।'' তারপর হাসতে হাসতে বললেন, ''এর চেয়ে এক থলে টাকা দিলেই তো পারত।''

যতীন্দ্রকুমার সেনের কাছে পরে জানতে পারলাম রাজশেখর নিজে ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। বললেন, ''গাণ্ডেরীরাম, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী এ দুটি মূর্তি কেমন হবে তা তিনি পোস্টকার্ডে ফাউন্টেন পেন দিয়ে এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি ঠিক তাই এঁকেছি। অনেক চরিত্রই তাঁর পরিচিত কারো না কারো সঙ্গে মিলিয়ে আঁকা।''

এ খবরটি আমার অজ্ঞাত ছিল। একবার চোখের কথা উঠতে রাজশেখর বলেছিলেন, মনে পড়ল, যে এখনও তিনি সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারেন, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়।

এমনি সব ছোটোখাটো টুকরো কথা। টুকরো কথা, কিন্তু তবু তার ভিতরে ভিতরে একটি সহৃদয় স্নেহের সূত্র সকল বিচ্ছিন্ন কথা এবং আমাদের তিনজনের পৃথক ব্যক্তিত্বকে বেঁধে রেখেছে, সেটি গভীরভাবেই অনুভব করলাম।

এমনি কত কথা, কত মুহূর্ত দেখা দিয়ে প্রতিদিন ঘরে বাইরের, পথে ঘাটে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনোটাকেই স্থায়ী ভাবে ধরে রাখা যায় না। ধরে রাখতে পারলে আপাতবিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন এইরকম কত হারিয়ে-যাওয়া মুহূর্তকে আমরা কৃপণের মতো একটু একটু করে উপভোগ করতে পারতাম।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে কথায় কথায়। রাজশেখরকে এতক্ষণ হয়তো বসিয়ে রাখা ঠিক হয়নি ভেবে আমরা উঠে পড়লাম।

গাড়িতে উঠে যতীন্দ্রকুমারকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তবে আমরা উত্তর-কলকাতায় ফিরব, এইরকম কথা হল। লেক রোড দিয়ে যাবার সময় একবার মনে হয়েছিল ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাওয়া যাক। কিন্তু গাড়ি তখন লক্ষ্যে ছুটেছে, প্রস্তাবটা বেসুরো লাগল।

হিমানীশ চারুচন্দ্রকে বলল, ''আগামী সোমবার (২৫ জানুয়ারি) 'বসুধারা' অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা করব।''

চারুচন্দ্র বললেন, ''না, আগামী সপ্তাহটাই বাদ দিয়ে যেয়ো।'' তারপর কিছু সলজ্জভাবে বললেন, ''শীতকাল লেপের তলায় আরামে শুয়ে শুয়ে ক্রিকেট-খেলার খবর শুনব, এ কটা দিন আর সবই আমার অনিশ্চিত।''

শুনে চমকে উঠলাম। মাত্র এক ঘণ্টা আগে চারুচন্দ্র আমাকে 'শিশু' বলেছিলেন।

কথাটা মনে পড়ল।

(প্রবন্ধটি রাজশেখর বসু মহাশয়ের জীবিতকালে রচিত)

▪বসুধারা পত্রিকা
আষাঢ়, ১৩৬৭

যতীন্দ্রকুমার সেন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

. কুড়ুলরাম রচিত, ঢেঁকিরাম বিচিত্রিত—যতদূর মনে পড়ছে, এই ভাবেই প্রথম দুজনের দুরন্ত আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যে। তারপর কুড়ুলরাম হলেন অদ্বিতীয় 'পরশুরাম', 'নারদ' রইলেন যথাস্থানে। তারও পরে 'নারদ', আর রইলেন না— স্বনামেই আত্মপ্রকাশ করলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন।

আমাদের ছেড়ে পরশুরাম আগেই চলে গেছেন। আজকের কাগজ যতীন্দ্রকুমারের মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনল। যাঁরা পরলোকে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলবেন দুই 'অত্যাগসহনো বন্ধু'র পুনর্মিলন ঘটল।

আবাল্য বন্ধুত্ব যৌথ-প্রতিভায় বিকশিত হয়েছিল 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'-র কর্মশালায়। গম্ভীরবেদী বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন 'বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে গিয়ে দেখি কখন তাহা' সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

সূচনা আগে থেকেই ছিল। আমাদের অস্পষ্ট ছেলেবেলায় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর সিরাপে'র সেই আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আজও মনে পড়ে—সেই সঙ্গে চিড়িয়াখানার ছবিটি। ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত শরীরে 'পাইরেক্সে'র সম্পর্কে স্বভাবতই কোনো আকর্ষণ ছিল না—কিন্তু সেই ঢোলোকধারীর অপূর্ব পোস্টার এবং 'আর জ্বর হয় না'—এই অভয় ঘোষণাতে মন তখনো পুলকিত হয়ে উঠত। বিজ্ঞাপনকে একাধারে কীভাবে শিল্প ও সাহিত্য করে তোলা যায় যতীন্দ্রকুমার-রাজশেখরের যুগল-প্রতিভা বাংলা দেশকে প্রথম তাঁর পথ দেখিয়েছিল।

পরশুরামের সেই প্রবল সাহিত্য-প্রবেশ কি এমন করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত—যদি তার সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের ছবি তাকে সাজিয়ে না দিত? 'গড্ডলিকা-কজ্জলী-হনুমানের স্বপ্ন' কি এমনভাবে বাঙালির প্রাণমন কেড়ে নিত—যদি না 'বাগর্থ-সম্পৃক্তি'র মতো পরশুরামের গল্পে রেখায় লেখায় সেই অপরূপ দ্বৈততান বেজে উঠত।

নিবিড়তম সৌহার্দ্যে দুটি মানুষ পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে চিনেছিলেন—দুজনের চিন্তায় কল্পনায় গড়ে উঠেছিল অনন্য সহযোগ। রাজশেখরের প্রতিটি চরিত্রকে রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলতেন যতীন্দ্রকুমার; আমরা যেন একটির পর একটি চলচ্চিত্র দেখে গেছি যার কাহিনিকার এবং সংলাপকার রাজশেখর—ক্যামেরাম্যান যতীন্দ্রকুমার।

পরশুরামের গল্পগুলোকে চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল ছবিরা-গণ্ডেরীরাম—বাটপাড়িয়া, রায়বাহাদুর তিনকড়ি, ছাগল লম্বকর্ণ, ভূষণ্ডীর মাঠে কারিয়া পিরেত শিবু, জিভকাটা লজ্জাবতী ডাকিনী, কবিরাজ তারিণী 'স্যান', হেকিম 'সূর্মা সূর্খ'! দেখা দিল 'কচিসংসদ'-এর নির্ভুল দলবল—ভ্রূকুটিলি নকুড় মামা থেকে একেবারে নেপালি চাকর 'বোদা' পর্যন্ত। 'রে-রে-রে' রবে উপস্থিত হলেন বালখিল্যেরা, শতদ্রুর উপল বন্ধুর তটে ঘৃতাচী যেন এই মুহূর্তে আমার সামনে দিয়ে এক পা নেচে গেলেন। 'বাঁদী পোতার গামছা খাটো করে পরা' স্বয়ম্বরা এগিয়ে এসে বললেন 'ঘুৎ মর্নিং' — 'পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটি কয়েক কাঁচা ভুট্টার দানা' বেড়িয়ে পড়ল। দেখতে পেলুম হনুমানের বজ্রমুঠিতে শূন্যে উড়তে উড়তে চলেছেন বানরী শ্রেষ্ঠা চলিম্পা—হাতের লীলা-কদলীটি তখনো যথাস্থানে শোভা পাচ্ছে!

বাংলাদেশের সব লেখক, সমালোচক, পাঠক সেদিন সমস্বরে রাজশেখর আর যতীন্দ্রকুমারকে একযোগে প্রশংসা করেছিলেন। তার একমাত্র কারণ, পরশুরামের বইতে লেখা আর রেখা অচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছিল। যেমন সেই বিশেষ ছবিগুলো ছাড়া 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' কে ভাবা যায় না, যেমন সেই দুর্লভ সংস্করণের ছবিগুলো ছাড়া 'ডন কুইক্সোট'-এর সম্পূর্ণ সৌন্দর্যই ফুটে ওঠে না, যেমন সুকুমার রায়ের ছবি বাদ দিয়ে 'বোম্বাগড়ের রাজা' কিংবা 'রামগড়ুরের ছানা' কে কল্পনা করাই অসম্ভব—তেমনি পরশুরামের একরাশ সেরা গল্প যতীন্দ্রকুমারের রেখা ছাড়া তাদের অর্ধেক সৌন্দর্যই হারিয়ে ফেলে।

এই কারণেই পরশুরামের শেষের দিকের বেশির ভাগ বই আমার কাছে অনেকখানি শ্রীহীন মনে হয়েছে। সেই ফিল্মের উপমাটাই মনে এল—যেন স্ক্রীপ্ট শুনেছি, ছবি দেখিনি। যতীন্দ্রকুমারের সহযোগে থাকলে 'ধুস্তুরী মায়া', 'নীল তারা', 'রটন্তীকুমার', 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' - এর মতো সেরা গল্পগুলো যেন আরও অনেক বেশি প্রাণ পেয়ে উঠত।

পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা ছাড়া সিরিয়াস গল্পউপন্যাসে ছবি দেওয়ার রেওয়াজ এখন আর নেই, এমন কি উডহাউসের অধিকাংশ কাহিনিই অনলঙ্কৃত, স্টিফেন লিকক তো ছবির ধার দিয়েই যাননি। খুব সম্ভব ছবি দিয়ে পাঠকের কল্পনাকে লেখক সীমিত করতে

চান না, তা ছাড়া শিল্পীর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্ব হয়তো সম্পূর্ণ সাড়া দেয় না। আমাদের বাংলা সাহিত্যেই নিজের বইয়ের প্রচ্ছদপট দেখে লেখকের পুরোপুরি খুশি হতে পারার ঘটনা, খুব সম্ভব 'কোটিকে গুটিক'।

আর পাঠকমনও কি নির্বিচারেই যে-কোনো 'ইলাস্ট্রেশন'কে মেনে নিতে পারে? আমি অনেক সময় অনুভব করেছি বড়ো লেখকের রচনার সঙ্গে শিল্পীর ছবি যেন বেসুরো হয়ে ওঠে—দুটো প্রবল ব্যক্তিত্ব কেউ কারো কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না, তার ফলে আশ্চর্য লেখার সঙ্গে আশ্চর্য ছবিকে আলাদাভাবে আস্বাদ করতে হয়, অদ্বৈতসন্ধিটি ঘটে না। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'মেন উইদাউট উইমেন' বইটির প্রথম মুদ্রণে যে চমৎকার স্কেচগুলো ছিল, বইটি পড়বার সময় তারা যে আমাকে খুব বেশি সাহায্য করেনি—বহুদিন পরেও সে কথা আমার মনে পড়ছে। হয়তো এই উদাহরণ ব্যক্তিগত, কিন্তু এর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা সাধারণ সত্য আছে।

ব্যক্তিত্বের এই ব্যবধান যত বাড়বে, লেখক এবং শিল্পীর মধ্যেও সেইভাবে পার্থক্য বেড়ে যেতে থাকবে। এমনকি, অ্যাবস্টাক্‌শ্যন দিয়েও দুই মনের গভীরতার সন্ধি ঘটবে না। স্যুর-রিয়ালিজ্‌মের পথেও কি তা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়েছিল?

রাজশেখর এবং যতীন্দ্রকুমার যে-যুগে মিলেছিলেন, সেকালে ব্যক্তিপ্রবণতার চাইতেও সামাজিক মননের সমভূমি ঢের বেশি প্রসারিত ছিল; বাংলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকের চেতনা সেদিন আজকের মতো এক-একটি নিঃসঙ্গতার দুর্গ অধিকার করেনি। তাই তাঁদের লেখায় রেখায় এমন মণি-কাঞ্চনযোগ ঘটেছিল, তাই একজন অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

আজ যতীন্দ্রকুমারের মৃত্যু এমন একটা কালের ওপর সমাপ্তি টানল—যে কাল আর কোনোদিন ফিরে আসবে না

■ যতীন্দ্রনাথ সেনের জন্ম ১৮৮২ সালে, তিরোধান ৩০-১১-১৯৬৬ তে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'সুনন্দ' নামে দেশ পত্রিকায় সাপ্তাহিক ফিচার লিখতেন 'সুনন্দর জার্নাল' শিরোনামে। ১০-১২-১৯৬৬ তারিখে সুনন্দর জার্নালে প্রকাশিত এই লেখাটি পুনঃ প্রকাশিত হল।

সরস চিত্রে

যতীন্দ্রকুমার সেন

(নারদ)

কুমারেশ ঘোষ

দুই বৃদ্ধ মুখোমুখি ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন ৭২ নম্বর বকুল বাগান রোডের দোতলা বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায়। একজন গৃহকর্তা স্বনামখ্যাত রস-সাহিত্যিক পরশুরাম (রাজশেখর বসু) এবং অন্যজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নারদ (যতীন্দ্রকুমার সেন)।

পরশুরামের 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' ইত্যাদি বইয়ের সরস গল্পগুলির সঙ্গে যেসব ছবিগুলো আঁকা রয়েছে, সেগুলি ঐ যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা। বইতে লেখা পরশুরাম রচিত, নারদ বা যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত। বই তিনখানি গল্পগুলি ও ছবিগুলি এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক' বা 'ছিঃ ছিঃ আর্যপুত্র যে!' 'পেলব ôþþ, ùÞ, ´ôÂÂ+ój', ýÞ Äôù ôù+úÞ ùþ, ýùþনতি পার না' ইত্যাদি ছবিগুলো আজও আমাদের মানসপটে আঁকা। যতীনবাবু আলাদা ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন খুব কমই এঁকেছেন, কিন্তু পরশুরামের প্রথমদিকের তিনখানি বইয়ের সরস গল্পগুলি চিত্রায়িত করতে যেসব ছবিগুলো এঁকেছিলেন, তা অনবদ্য—ব্যঙ্গচিত্রেরই সমধর্মী। শুধু তাই নয়, লেখকের কল্পনার বাস্তব চিত্ররূপ সেগুলি।

পরশুরাম যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি প্রতি বছরে শারদীয়া যষ্টি-মধু-র জন্যে সরস গল্প উপহার দিতেন। উপহার দিতেন, এইজন্য বললাম যে, বড়ো বড়ো পত্রিকায় তিনি গল্পের জন্যে দক্ষিণা নিতেন, কিন্তু আমাদের পত্রিকায় তিনি সস্নেহে বিনা দক্ষিণায় গল্প দিতেন। তার কারণস্বরূপ তিনি একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, অনেক পত্রিকা আসে আমার কাছে, কিন্তু সব পড়বার সময় হয় না, বা মন চায় না। আপনার পত্রিকাটি কিন্তু না পড়ে পারিনে। লক্ষ করে দেখেছি যষ্টি-মধু-তে ছ্যাবলামি নেই, ভাঁড়ামি নেই আর নেই ব্যক্তিগত আক্রমণ। (তিনি সবাইকেই 'আপনি' বলতেন।)

শুনে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলাম।

গল্পগুলি পরে তাঁর একমাত্র পুস্তক প্রকাশক এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স যখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করতেন তাতে সেই 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' বা 'হনুমানের স্বপ্ন' ইত্যাদির মতো কোনো ছবি থাকত না। তাঁর শেষদিকের গল্পের বই, 'ধুস্তুরীমায়া', 'আনন্দীবাঈ', 'নীলতারা' ইত্যাদিতে কোনো ছবি নেই। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এর কারণ কী? রাজশেখরবাবু সামনে যতীনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, আগে আমার গল্পের ছবি আমার মনের মতো করে উনি আঁকতেন। এখন সেরকম হয় না বলে আমি গল্পে ছবি দিতে বারণ করেছি। অবশ্য পত্রিকাতে আমার গল্প সম্পাদকরা সচিত্রই প্রকাশ করেন। হ্যাঁ, আমরাও যষ্টি-মধু-তে করতাম।

যতীনবাবুর বয়স হওয়ায় তিনি শেষদিকে আর ছবি আঁকতেন না। তাই পরশুরামের গল্পগুলি বৈচিত্র্যময় হলেও ছিল চিত্রহীন।

যতীন সেন মশায়কে একবার কার্টুনের কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে যে কার্টুনটি দিয়েছিলেন, সেটি এখানে প্রকাশিত হল : 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'। তরুণী স্ত্রী খাটে শুয়ে বই পড়ছিলেন, এমন সময় ঘরে খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর প্রৌঢ় টাকমাথা স্বামী। দেখে স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন বিতৃষ্ণায়।

রাজশেখরবাবু আমাকে বললেন, এই ছবিটার মেঝেতে একটা বেড়াল আছে লক্ষ করুন। ওটি যতীনবাবু প্রথমে আঁকেননি। আমি বললাম, তরুণী ভার্যার সন্তান হয়নি, কাজেই একটি মা ষষ্ঠীর বাহন এঁকে দিন। তাই দেখছেন ঐ বেড়াল!

যতীনবাবুর আর একখানি কার্টুন যষ্টিমধুতে ছাপা হয়েছিল। স্বামী স্ত্রীর মানভঞ্জন করতে গিয়ে গলদঘর্ম। তাঁর পুত্রটি তাই তাঁকে বাতাস করছে। ছবিখানির রেখা যদিও কার্টুন পর্যায়ে পড়ে না, তবে বিষয়বস্তু ব্যঙ্গরসাত্মক।

আগে সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র বেশি আঁকা হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এবং পরে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় পত্রপত্রিকায়। তবে যতীনবাবু ভারত স্বাধীন হবার সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের সচিত্র ক্যালেন্ডারের জন্যে যে ছবিখানি এঁকেছিলেন সেটিতে রাজনৈতিক গন্ধ যেন খানিকটা পাই। ছবিখানির কথা হয়তো অনেক

প্রবীনেরই মনে আছে—একটি সিংহের পশ্চাদ্দেশের ছবি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যতীনবাবুকে, আপনি সিংহের মুখ না এঁকে তার পশ্চাদ্দেশ আঁকলেন কেন? শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্রিটিশ সিংহের ভারত ছেড়ে চলে যাবার দৃশ্য।

রসিক না হলে রসচিত্র বা ব্যঙ্গচিত্র আঁকা যায় না। যতীনবাবু ছিলেন রাজশেখর বসুর মতোই বাইরে গম্ভীর, কিন্তু ভেতরে রসিক। রসের ফল্গুধারা বইতো দুই বৃদ্ধের মনে।

একবার পুজোর মুখে। যষ্টি-মধু-তে শারদীয়া সংখ্যায় পরশুরামের গল্প বেরিয়েছে। বইখানি হাতে করে তাঁকে দেবার জন্য বকুল বাগানে তাঁর বাড়িতে গেছি। যথারীতি দক্ষিণের বারান্দায় দুই সরস-গম্ভীর বৃদ্ধ বন্ধু মুখোমুখি বসে। যষ্টি-মধুখানি রাজশেখরবাবুর হাতে দিতেই তিনি বললেন, আপনার পূজাসংখ্যাই আগে পেলাম। বললাম, কেন 'বসুধারা' পত্রিকাও তো বেরিয়ে গেছে, পাননি? বললেন, না। গল্প নেবার বেলায় সব ঠিক আসেন, বই দেবার বেলায় মনে থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে যতীনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, বসুদের ধারাই ওই রকম। যতীনবাবু এক ঢিলে তিন পাখি মারলেন—রাজশেখর বসুকে, বসুধারাকে এবং বসুধারা-র প্রকাশক কে.পি. বসু অ্যান্ড কোং-কে।

গান আছে, তোমার মহাবিশ্বে হতে হারায় নাকো কিছু। হয়তো। তবে অনেক কিছু চাপা পড়ে আছে। যতীন্দ্রকুমার সেনের জীবনকথা ও চিত্রশিল্প চাপা পড়ে আছে। তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার মনে করি।

■যষ্টি-মধু
"সেকালের কার্টুন" সংখ্যা

'যষ্টিমধু' পত্রিকায় প্রকাশিত যতীন্দ্রকুমারের সেই ব্যঙ্গচিত্র

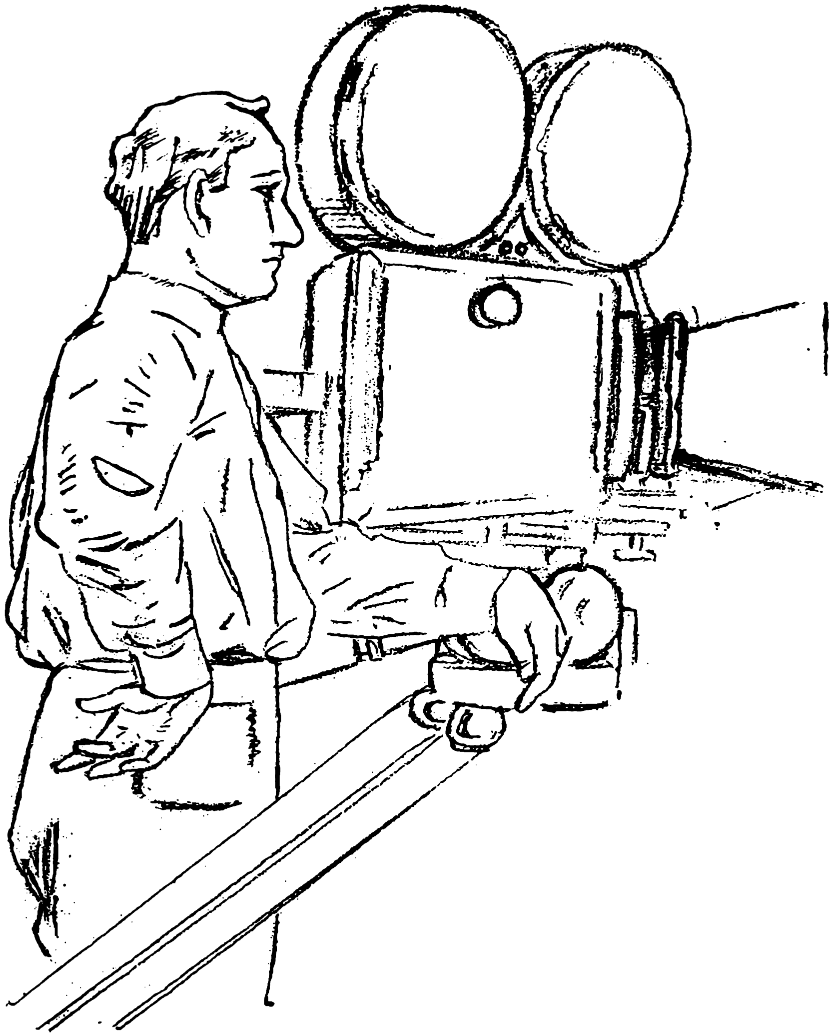

● চিত্রপরিচালক নীতিন বসুর প্রতিকৃতি : শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন

● দীপংকর বসুর সৌজন্যে

"তাঁর জীবনের শেষ ছবি এঁকেছিলেন আমার অটোগ্রাফের খাতায় ... "

(একটি কথোপকোথন)

(রাজশেখর বসুর দৌহিত্রী আশা দেবীর একমাত্র পুত্র দীপংকর বসু অনেক অকথিত কাহিনী শুনিয়েছেন 'বিষয় কার্টুন'কে। বলেছেন অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় বকুলবাগানের বাড়িতে বসে ...। যতীন্দ্র কুমার সেন ছিলেন তাঁর 'নতুন দাদু', তিনি ছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেনের 'দাদুম ভাই')

প্রশ্ন: প্রবাদপ্রতীম শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের জন্ম ১৮৮২তে। ২০০৭ সালে আমরা তাঁর জন্মের ১২৫ বর্ষে উপনীত। এই মানুষটি কে এক কথায় আমরা কি বলে অভিহিত করবো?

উঃ: যতীন্দ্রকুমার স্বভাবসিদ্ধ শিল্পী, জন্মগত প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পীকে আমরা আমাদের দেশের সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন শিল্পী বা সার্থক কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট বলে অভিহিত করতে পারি।

প্রশ্ন:ওঁর জন্ম কোথায়? প্রাথমিক শিক্ষাই বা কোথায়?

উঃ:ওঁর জন্ম বিহারের দরভঙ্গায়। যেটির বর্তমান পরিচিতি দ্বারভাঙা নামে। ওখানকার স্কুলেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ।

প্রশ্ন:সাহিত্যিক পরশুরাম তথা রাজশেখর বসুর সঙ্গে কি সূত্রে পরিচয়? সে পরিচয় পরিণতিই বা পেল কী ভাবে?

উঃ:বর্ধমানের বামুন পাড়া গ্রামে রাজশেখরের জন্ম। তাঁর পিতা চন্দ্রশেখর দরভঙ্গার রাজার স্টেটে চাকরী করতেন, তাই শৈশব কেটেছে সেখানে। সেখানেই যতীন সেনের সঙ্গে তাঁর বাল্য পরিচয়। কিন্তু সেখানে যতীন সেন আসলে বন্ধু ছিলেন রাজশেখরের অনুজ কৃষ্ণশেখরের। রাজশেখররা চার ভাই ছিলেন - শশিশেখর, রাজশেখর কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর। ২য় ও শেষ জনের বিশাল পরিচিতি, শশীশেখর সম্বন্ধেও এখন লোকে কিছু জানতে পেরেছে, কিন্তু কৃষ্ণশেখর সম্বন্ধে প্রায় সব তথ্যই অজানা। মেধাবী কৃষ্ণশেখর কাজ করতেন ভারত সরকারের সিমলা কমিশারিয়েটে। ইংরেজ আমলে সেটাই ছিল দেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। অবসর গ্রহণের পর নদীয়া জেলার উলা- বীরনগর গ্রামে গিয়ে আস্তানা গাড়লেন। পিতা চন্দ্রশেখর প্রথমে দরভঙ্গা ও পরে মিথিলাতে চাকরী করলেও মুঙ্গেরের খড়্গপুর আর নদীয়ার উলাতে সম্পত্তি কিনেছিলেন। উলা তখন ছিল ম্যালেরিয়ার ডিপো, ওখানকার লোক ম্যালেরিয়ায় জ্বর আসা ও জ্বর ছাড়াকে ১০টা ৫টা চাকরীর সঙ্গে তুলনা করতো। কারণ রোজ সকালে তেড়ে জ্বর আসত দুপুরের মধ্যে ছেড়ে যেতো। উলাতে গিয়ে মশা দমনের জন্য কৃষ্ণশেখর অনেক চেষ্টা করেছিলেন। গ্রাম পরিষ্কার হলো, মশাও নিশ্চয় কমেছিল, কিন্তু পরে নির্দলপ্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণশেখর হেরে গেলেন ৪৭ এর পরে।

এরপর রাজশেখরের বিদ্যার্জনের সম্বন্ধে দু-একটা কথা—তখন এম.এ তে দুটো কোর্স ছিল 'এ' এবং 'বি' ... 'বি' তে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া যেতো, রাজশেখর এম.এ পাশ করলেন রসায়নে, সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য বিভাগে পড়ে আইনও পাশ ফেললেন। ১৯০১ সালে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন করলেন, ঐ বছর থেকে যতীন সেন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন। ১৯০৩ সালে রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিলেন জুনিয়ার কেমিষ্ট হয়ে ... ১৯৩২ সালে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে অবসর নেন ... তাঁর আমলেই বেঙ্গল কেমিক্যাল দক্ষতা এবং খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে চলে গিয়েছিল ... যা আজ ইতিহাস। সে সময় লোকে বেঙ্গল কেমিক্যালের ১০০ টাকার শেয়ার ৪০০ টাকাতেও কিনতে ইতস্ততঃ করতো না। ১৯০৩ সাল থেকেই রাজশেখর যতীন্দ্রকুমারের চিত্র প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

প্রশ্ন: কলকাতায় যতীন্দ্রকুমারে'র সঙ্গে রাজশেখরের যোগাযোগ কিভাবে হয়?

উঃ:সেটা ঠিক বলতে পারব না, তবে পার্শিবাগানে গিরীন্দ্রশেখরের বাড়িতে যখন রাজশেখর থাকতেন, 'উৎকেন্দ্র সমিতি'র আড্ডা নিয়মিত বসতো, সে আড্ডায় অনেক নামজাদা লোকেরা আসতেন। যতীন সেন ছিলেন সে আড্ডার কর্ণধার, তিনি তখন থাকতেন বাদুড়বাগানে ঘর ভাড়া নিয়ে। সাতটা সাড়ে সাতটায় এ বাড়ির আড্ডা বন্ধ হতো, তখন উনি চলে যেতেন চিত্রা সিনেমা হলে (এখন মিত্রা)—সেখানে নিউ থিয়েটার্সের আড্ডা শুরু হতো। থাকতেন বি.এন.সরকার, অমর মল্লিক, দেবকী বসু, নীতিন

বোস, মুকুল বসু (বিখ্যাত শব্দযন্ত্রী)...মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যেতেন প্রমথেশ বড়ুয়া। সে আড্ডা ভাঙত রাত সাড়ে নটা-দশটা, সেটা তখনকার কালে উত্তর কলকাতায় প্রায় গভীর রাত। এই চিত্রা সিনেমার ফ্রেসকোটি এঁকেছিলেন যতীন্দ্রকুমার। ঐ আড্ডা থেকে নিউ থিয়েটার্সের অতি বিখ্যাত হাতী মার্কা লোগোটি তৈরী হয়, তাতে ব্যবহৃত সংস্কৃত শ্লোকটি লিখে দেন সুনীতি চাটুজ্জে ... ঐ লোগোর সমস্ত আর্ট ওয়ার্ক ও ক্যালিগ্রাফী যতীন্দ্রকুমারেরই করা।

বেঙ্গল কেমিক্যালে থাকাকালীনই রাজশেখরের সাথে সাথে সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। টেকনিক্যাল বাঙলা বিজ্ঞাপনের সূচনা করেছিলেন প্রথম রাজশেখরই। বেঙ্গল কেমিক্যালের সমস্ত বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা ও খসড়া তিনি নিজে করতেন, তাঁর নির্দেশ মতো যতীন সেগুলো চিত্রায়িত করতেন। ১৯৩২ সালে অবসর না নওয়া পর্যন্ত রাজশেখর বিজ্ঞাপন ও প্রচারচিত্র, মোড়ক ইত্যাদির বয়ান লিখেছেন ... তিনি নিজেই লিখেছেন ...বাল্যের কবিতা বাদ দিলে চাকরীকালীন বিজ্ঞাপন লেখাই আমার একমাত্র সাহিত্য কর্ম। সেই লোকই যখন সাহিত্যের জন্য কলম ধরলেন মনে হলো কত পাকা হাত! আর সেই সময় থেকেই যতীন সেন ভারতের প্রথম কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হয়ে উঠেছিলেন। তারপর ধরুন বই-এর প্রচ্ছদ। একটা দশকপ্রচ্ছদ শিল্পী যতীন সেনকে ছাড়া কাউকে ভাবা যেতো না। নজরুল, সত্যেন দত্ত আরো বহু সাহিত্য মহারথীর বই-এর প্রচ্ছদ তাঁর করা। যখন ১৯৩১ সালে প্রথম রবীন্দ্ররচনাবলী বের হলো, মরক্কো লেদার বাঁধানো সেই রাজসংস্করণের মলাটে এমবস্ করা রবীন্দ্রনাথের ছবি থাকতো, ছবিটা তৈরী হয়েছিল ব্রেল পদ্ধতিতে ... সে কাজটাও করেছিলেন যতীন। স্বয়ং যামিনী রায় যতীনের কাজের তারিফ করততন। তারপর পরশুরামের চরিত্রদের চিত্রায়ন,পত্র পত্রিকার অলঙ্করণ এবং কার্টুন আঁকা ... এর পরিচয় সবাই জানেন।

একটা আশ্চর্য কথা বলি-বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না এবং সেটা সেই ১৯০৩ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত। অবশ্য শেষ দিকে দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, সহযোগী শিল্পীরাই তাঁর নির্দেশনায় কাজ করতেন, প্রধান সহযোগী ছিলেন চৈতন্য ধর। যখন একেবারেই কাজ করা ছেড়ে দিলেন ১০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা হলো, সেটাও হয়েছিল রাজশেখরের চেষ্টায়। তবে রাজশেখরের সঙ্গে যখন ভারত ভ্রমণে বেরোতেন তখন অফিস থেকে তাঁর ভ্রমণের ব্যয় বহন করতো। যতীন ভালো ছবি তুলতে পারতেন বলে ক্যামেরা সঙ্গে থাকতো।

প্রশ্ন:ওঁর ফটোগ্রাফীর চর্চা কেমন ছিল?

উঃ: যতীন্দ্রকুমার দস্তুর মতো পাকা ফটোগ্রাফার ছিলেন, তবে একটা কায়দা উনি জানতেন ... নিজেই ফটো ডেভালাপ করতেন ডার্করুমে। সে সময় খারাপ নেগেটিভ কারিকুরি করে ভোলই পাল্টে দিতেন। আর একটা বিষয় বলি ... ছবিতে ফিগার আঁকার চেয়ে ঢের ভালো ছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য ,গাছপালা জীবজন্তুর ছবি।

প্রশ্ন: কর্মস্থল থেকে টাকা নিতেন না যখন তখন ওনার খরচ চলতো কি করে?

উঃ: আমার নিজের চোখে দেখা ... আনন্দবাজার গোষ্ঠীর শারদীয় সংখ্যায় 'মলাট' করেছেন বলে ৮০০ টাকা তখনকার দিনে পেমেণ্ট পেয়েছিলেন। তা ছাড়া অন্যান্য কাজতো ছিলই।

প্রশ্ন : পরশুরামের কী কী কাজ উনি করেছিলেন?

উঃ: পরশুরামের 'গড্ডালিকা', 'কজ্জলী' আর 'হনুমানের স্বপ্ন' এই তিনটে বইয়ের প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন ওঁর করা। তারপর রাজশেখর প্রায় ১২ থেকে ১৪ বছর ব্যস্ত ছিলেন রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদের কাজে ও চলন্তিকা সঙ্কলনে। এরপর 'গল্পকল্প' বেরোল, প্রচ্ছদ রাজশেখরেরই, নীলতারার হীরের ছবিটাও ওঁরই আঁকা, লেখা যতীনের। তবে 'ধুস্তুরী মায়া' প্রচ্ছদ যতীনের করা।

প্রশ্ন : যতীন সেনের কার্টুন চর্চার সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন?

উঃ: নতুন দাদুর শিল্পকীর্তির মধ্যে কার্টুন অন্যতম। ওঁর অনেক কার্টুন সে যুগের বহু নামকরা পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যালেণ্ডারের ছবি উনি প্রত্যেক বছরই করতেন। একটি পুরনো ছবি ছিল—বিরাট এক সিংহ পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে, তলায় ক্যাপসান 'আবার আসিব ফিরে পূর্ণিমা রাতে' ... ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির পশ্চাদপসরণ! বহুদিন আগে (Dilemma) ওঁর একটি অ্যালবাম ছাপা হয়েছিল, কিছু ছবির সমষ্টি নিয়ে, তার শেষ ছবি ছিল প্রকাণ্ড একটি চরকা এবং এক মহাকায় সিংহ সেই চরকা শুঁকে দেখছে। ছবির টাইটেল ছিল DAILEMMA ছবির অর্থ ব্রিটিশ রাজ versus খাদি। মজার ব্যাপার হল পারশি বাগানের বাড়িতে যেখানে নতুন দাদু অনেকটা সময় কাটাতেন, সে সময় মাঝে মাঝেই কোন না কোন অপরিচিত লোক এসে তাঁকে সেই ছাপানো অ্যালবামটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতো ... মশাই এই ছবিটার মানে কী? নতুন দাদু উদাসীন ভাবে বলতেন ... ছবি ছবিই, ওর আবার মানে কী হবে। আসলে উনি বুঝতে পারতেন এরা সি. আই. ডি'র লোক, ছবিটাতে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়েছে তাই আসছে।

• দীপংকর বসুর অটোগ্রাফ সংগ্রহের খাতায় আঁকা শিল্পীর সেই ছবি

দীপংকর দাসগুপ্ত-এর অনুরোধে —
৭৩-এ পড়েও তবু
আঁকতে হল ছবি।
এইসঙ্গে হয়ে গেলাম
একটা হাস্য-কবি!
দৃষ্টিক্ষীণ তবুও তুলি
লাগিয়ে দিয়ে অন্ধ ঝুলি
একরকমে দুটো ছাঁদ
মেরে দিলাম তাড়া।

ছবিতে সাধু হুইসলিং টোম'
নীলচে পাতায় ভক্তি সুবাস
যশিডিতে দেখেছিলাম
মনে করে এঁকে দিলাম।

এবার আমার নাম
যতীন্দ্রকুমার সেন
কবি গোষ্ঠীর কাম।

১৩ই এপ্রিল
১৯৫৭

• অটোগ্রাফ খাতায় শিল্পী হস্তাক্ষরে লিখিত কবিতা

প্রশ্ন : এই বাড়ি ... ছেলেবেলা। জ্ঞান হয়েই দেখেছিলেন যতীন সেন কে, সে সময়ের কিছু কথা বলুন।

উঃ: বকুলবাগানের এই বাড়িতে তাঁর একসময় প্রাত্যহিক যাওয়া আসা চলতো। তাঁকে আমি নতুন দাদু বলতাম, তিনি আমাকে দাদুম ভাই বলে ডাকতেন। একটা সময় উনি পাকপাড়ায় থাকতেন। সেখান থেকে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ১টা দেড়টা নাগাদ এ বাড়িতে এসে হাজির হতেন, একতলার একটা ঘরের বিছানায় খানিকটা জল খেয়ে শুয়ে পড়তেন, কখনো এক আধটা বইয়ের পাতা উল্টোতেন শুয়ে শুয়েই, তারপর ঘুম। ঘুম থেকে উঠে ওপরে জলখাবার খাওয়া তারপর বারান্দায় দাদুর সামনে বসে গল্পগুজব। রাত্রে চলে যেতেন, এক হাতে বেতের বাঁটের সেকেলে ছাতা, আর অন্য হাতে থলি। এটাই রোজকার রুটিন, এমন কী হরতাল হলেও নতুন দাদু তাঁর থলি ও ছাতা নিয়ে একটু দেরিতে এসে পড়তেন। বেশ মনে আছে ওপরের বারান্দায় রাজশেখর ও যতীন দুজনেই বসে কথা বলছেন, বেশী কথা যতীনই বলতেন দাদু (রাজশেখর) শুনতেন। কোন কথায় তথ্যে ভুল থাকলে দাদুর ধমক খেতেন। সংস্কৃতে দুজনের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, যতীন মাঝে মাঝেই সংস্কৃত শ্লোক বলতেন। একদিন আমিও হাজির রয়েছি, নতুন দাদু একটা শ্লোক আবৃত্তি করলেন, তারপর পুজোর মন্ত্র পুরোহিতরা যে ভাবে বলে সে ভাবে সুর করে একই শ্লোক শোনালেন। আমি হাসতে হাসতে লক্ষ্য করলুম দাদুর মুখেও বিশাল হাসি, চিরগাম্ভীর্য ছেড়ে মুখ উদ্ভাসিত। এমনিতে খুব গম্ভীর মানুষ হলেও রাজশেখরের মধ্যে ছিল সুরসিক অন্তর, যে কোন লোকের ক্যারিকেচার করে উনি দেখিয়ে দিতে পারতেন, ক্যারিকেচার এঁকে দেখাবার ব্যুৎপত্তি ভালোই ছিল।

প্রশ্ন: শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে আপনার নতুন দাদু ... নিশ্চই ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছেন ... তা নিয়ে কিছু বলুন?

উঃ: যতীন দাদুকে 'নতুন দাদু' বলার কারণ রাজশেখর 'দাদু', উনি 'নতুন' দাদু। পার্শিবাগানের বাড়ীতে রাজশেখরদের ভগ্নীদের, ভাগ্নে, ভাগ্নীদের অবাধ থাকা যাতায়াত চলতো। রাজশেখরের স্ত্রী মৃণালিনী যোগেশ চন্দ্র দের চতুর্থ কন্যা। যোগেশচন্দ্র মধ্য কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে'র পুত্র। সে বাড়িরই এক ছেলে বিষ্ণু দে এবং দে পরিবারের অপর এক অংশে বিবাহ হয়েছিল শরৎচন্দ্র বসুর। মাঝে মাঝে দেখা যেতো দে বাড়ির উপরের বারান্দায় তিন বোস জামাই বসে আছেন : রাজশেখর বোস, শরৎ বোস, জ্ঞান বোস। তিন জনেই স্বনামধন্য। শ্যামাচরণের বাড়িটি এখন প্রকাশনা সংস্থা দে'জ পাবলিশিং এর সম্পত্তি, এরা অবশ্য ওই দে পরিবারের লোকই নন।

নতুন দাদুকে দেখেছি খুব কাছ থেকে। তাঁর ছবি আঁকাও দেখেছি। ১৯৫৭তে আমার অটোগ্রাফ জমানোর শখ হলো, আমার খাতায় অটোগ্রাফ চাইলুম নতুন দাদুর কাছ থেকে, তখন তিনি প্রায় অন্ধ। গ্লুকোমা ছিল ... বাড়তে বাড়তে একটু বেশী বয়সে অপরেশন হলো ... কিন্তু দৃষ্টি ফেরত এলো না। যাই হোক উনি আঁকলেন একটা ইউক্যালিপটাস গাছ ... রঙ্গীন ছবি ... সঙ্গে কবিতা -

"৭৩ এ পড়েও তবু আঁকতে হলো ছবি।
সেই সঙ্গে হয়ে গেলাম একটা হঠাৎ কবি।
দৃষ্টি ক্ষীণ অচল তুলি
লাগিয়ে দিয়ে পদ্যে বুলি
একরকমে দুটো কাজ
সেরে দিলাম আজ।
ছবিতে গাছ 'ইউক্যালিপটাস'
নীলচে পাতায় অতি সুবাস
যশিডিতে দেখেছিলাম
মনে করে এঁকে দিলাম।
এবার আমার নাম
যতীন্দ্র কুমার সেন
করি পোটোর কাম।"
... এটিই ওঁর জীবনের শেষ শিল্পকীর্তি।

নতুন দাদু রাজশেখরকে সম্বোধন করতেন 'মেজদা' বলে। দক্ষিণ কলকাতার মুদিয়ালীতে কিছুদিন থাকার পর চলে গিয়েছিলেন পাইকপাড়ায়, সেখান থেকেও আসার বিরাম ঘটে নি। অনেক পরে আবার ফিরে এলেন সেই মুদিয়ালী, তখন সেটা লেক এ্যাভিনিউ। অনেক বয়সে যখন চলা ফেরা বন্ধ হলো তখন কেউ তাঁকে এ বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যে গেলে আগে জিজ্ঞেস করতনে - মেজদা ভাল তো? যখন বার্ধক্য জনিত কারণে অসুস্থ, বাসা নিলেন ভবানীপুরে কেদার বসুলেনে। তখন দাদু

(রাজশেখর) মারা গেছেন, নতুন দাদু আরো ছ বছর বেঁচেছিলেন।

এবার নতুন দাদুর দুটো গুণের কথা বলি ... ছবি নিখুঁত রাখার জন্য নানারকম বই পড়তেন। শশিশেখরের ছেলে মৃগাঙ্কভূষণ পটনায় অধ্যাপনা করতেন, তাঁর কাছ থেকে বোটানি, জুলজি'র বই চেয়ে পড়তেন নতুন দাদু, জন্তুজানোয়ার আর গাছপালার ছবি আঁকার আগে তাদের বিশেষত্ব জানার জন্য। ছবি আঁকার পাশাপাশি অসাধারণ গহনার ডিজাইন করতে পারতেন, মুগ্ধ হয়ে দেখতে হতো। বলা যেতে পারে শিল্পকর্ম হিসাবে ওঁর অতুলনীয় দক্ষতা। নতুন দাদুর দেওয়া আলপনা ছিল অনন্য শিল্পকর্ম, যাঁরা তা দেখেছেন তাঁরা সৌভাগ্যবান। আমার মার বিয়ের গহনা গড়ানো হয়েছিল নতুন দাদুর ডিজাইন মতো। আমাদের আত্মীয়স্বজন রাজশেখরের ভাগ্নে-ভাগ্নীরা তাঁকে মাষ্টারমশাই বলে ডাকতেন কারণ গান শেখাতেন অসাধারণ অথচ নিজে গান গাইতেন না যেটুকু শেখানো সেটা ছেড়ে। চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমারের যে সঙ্গীতেও এতখানি দখল ছিল তা অনেকেই জানেন না। আমাদের বাড়িতে PUTNAM কোম্পানীর একটা অর্গান ছিল, ছোটবেলায় দু-একবার দেখেছি নতুন দাদু সেটা বাজিয়ে চমৎকার সুর তুলছেন। আমার দিদিমা অর্থাৎ রাজশেখরের মেয়ে প্রতিমাও তাঁকে মাষ্টারমশাই বলতেন কারণ তাঁকেও গান শিখিয়েছিলেন নতুন দাদু। আমার এই দিদিমা আর দাদামশাই (অমর নাথ পালিত) একই দিনে মারা যান, তাঁদের একমাত্র সন্তান আমার মা (আশা) তাঁর দাদামশাই (রাজশেখর) এর কাছে মানুষ হন।

প্রশ্ন:সমকালীন শিল্পী নিয়ে কোন ঘটনা মনে পড়ে?

উঃ: হাতে গুনে বলা যায় সামান্য কয়েকজনকে এ বাড়িতে আসতে দেখিনি। আপাতত কেবল সত্যজিৎ রায়ের কথা বলি। এ বাড়ীতে যখন এসেছেন, তিনি তখন বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক নন, ডি.জে. কীমারের কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। তিনি এসেছেন, রাজশেখর, যতীন্দ্রকুমার দুজনের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। দুজনেই সত্যজিতের করা লক্ষ্মীঘিয়ের বিজ্ঞাপন চিত্রের ভূয়সীপ্রশংসা করেছিলেন। সে ছবিতে দেখানো হয়েছিল একটি মোটা সোটা লোক লক্ষ্মী ঘিয়ে ভাজা লুচি খেতে খেতে হাতের দুটো আঙ্গুল তুলে আরো দুটো লুচি চাইছে।

সে বছর আনন্দবাজার পত্রিকায় পরশুরামে'র 'সরলাক্ষ হোম' গল্পের চিত্রাঙ্কন করেছিলেন সত্যজিৎ রায় ... পারিশ্রমিক হিসাবে নিয়েছিলেন গল্পটির পাণ্ডুলিপি। কারণ রাজশেখরের পাণ্ডুলিপি ছিল নিছক পাণ্ডুলিপি নয়, অসাধারণ শিল্পকর্ম।

'পরশ পাথর' ছবি করার সময় চিত্রসত্বের টাকা চারবারে এসে দিয়ে গিয়েছেন, সম্ভবতঃ বারেবারে রাজশেখরের সান্নিধ্য পাবার জন্যই। একবার সত্যজিৎ এসেছেন, রাজশেখরের সঙ্গে কথা হচ্ছে, যতীনও রয়েছেন। যতীনের প্রস্তাব: হযবরল নিয়ে কার্টুন ছবি করুন, আপনার হাতে ভালো হবে।প্রস্তাব শুনে সত্যজিতের উক্তি হযবরল তৈরী করতে আপনার মত অন্ততঃ দশ জন ভালো শিল্পীর প্রয়োজন। বলা বাহুল্য তখন কার্টুন ছবি তৈরীর পদ্ধতি অনেক শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল।

প্রশ্ন: রাজশেখর ও যতীন্দ্রকুমার এই দুই সুহৃদ ... আমৃত্যু তাঁদের বিচ্ছেদ হয় নি?

উঃ: ঠিক তাই। দাদু (রাজশেখর) ও নতুন দাদু আমৃত্যু সুহৃদ। আমার মনে পড়ে রাজশেখরের প্রয়াণের দিন, এ বাড়ির এক তলার বসবার বড় ঘরে তাঁর দেহ শেষশয্যায় শায়িত, নতুন দাদু ঘরের এক কোণে বসে আবৃত্তি করছেন শ্রীমদ্ভবদ্গীতার সেই শ্লোক ... বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় ... নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। তারপর নীরবে বসে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। রাজশেখর মারা গেলেন ১৯৬০ সালের ২৭এপ্রিল। নতুন দাদু চলে গেছেন ১৯৬৬ সালের ২৯ নভেম্বর, তখন তিনি ভবানীপুরের কেদার বসু লেনে থাকতেন তাঁর মৃত্যুতে কোন আলোড়ন হল না। অসাধারণ শিল্পী অতি সাধারণ ভাবেই চলে গেলেন।

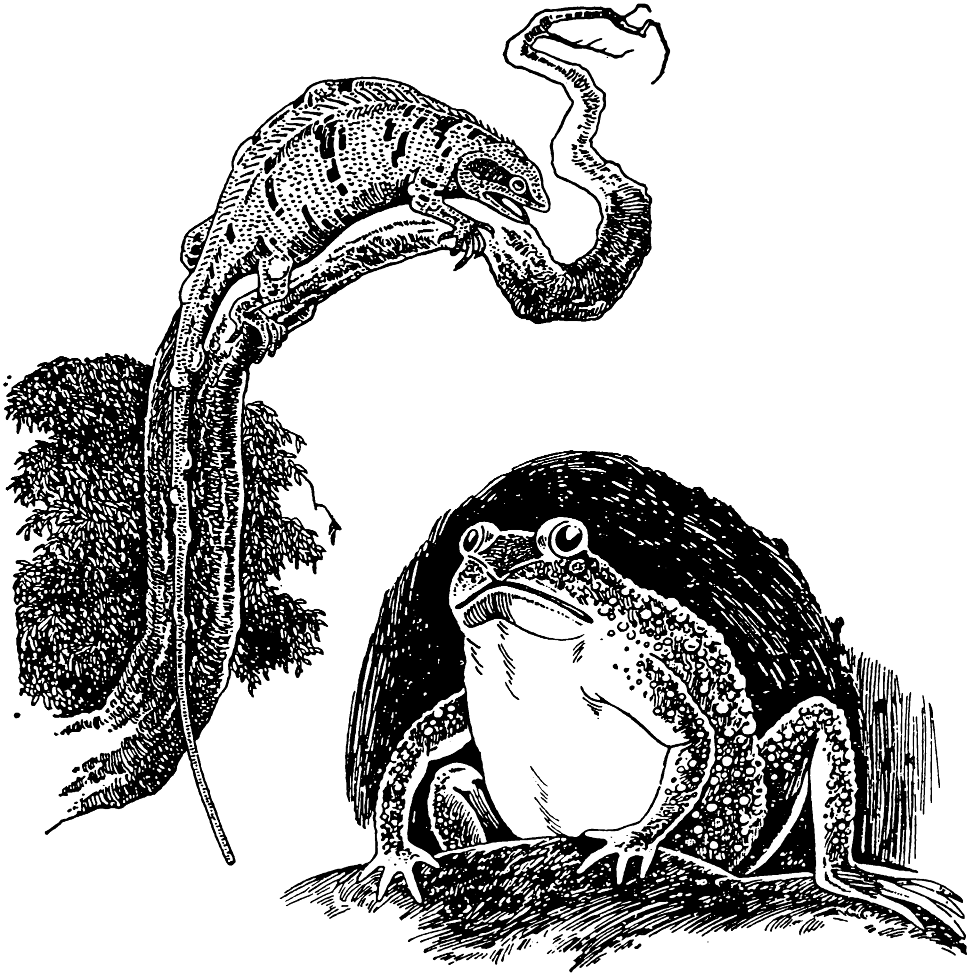

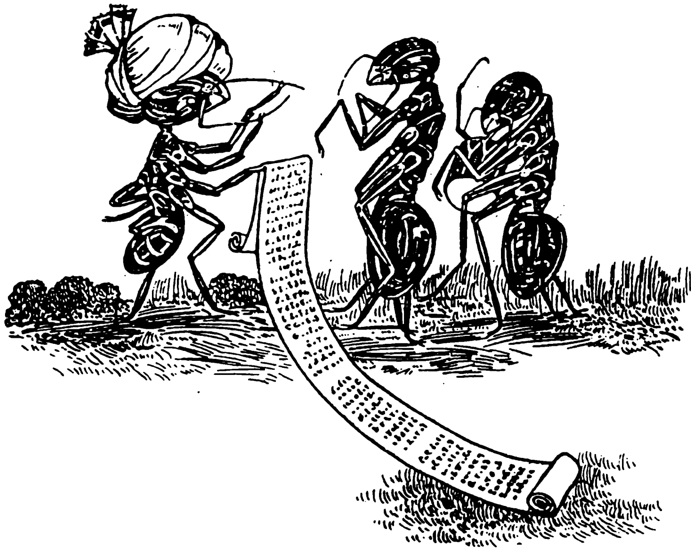

গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লাল কালো' বইতে যতীন্দ্রনাথের অনবদ্য অলংকরণ

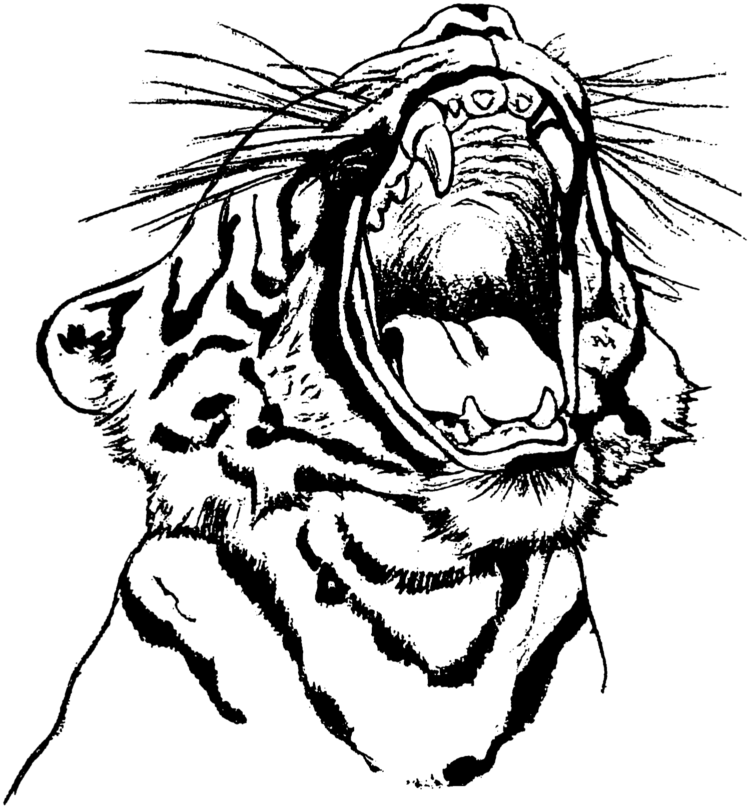

• যতীন্দ্রকুমার সেন কৃত অপ্রকাশিত স্কেচ

• দীপংকর বসুর সৌজন্যে

Two-Colour Line Block. For indications of second Colour (yellow) please see back.

Colours for the printer

Bloc for Black

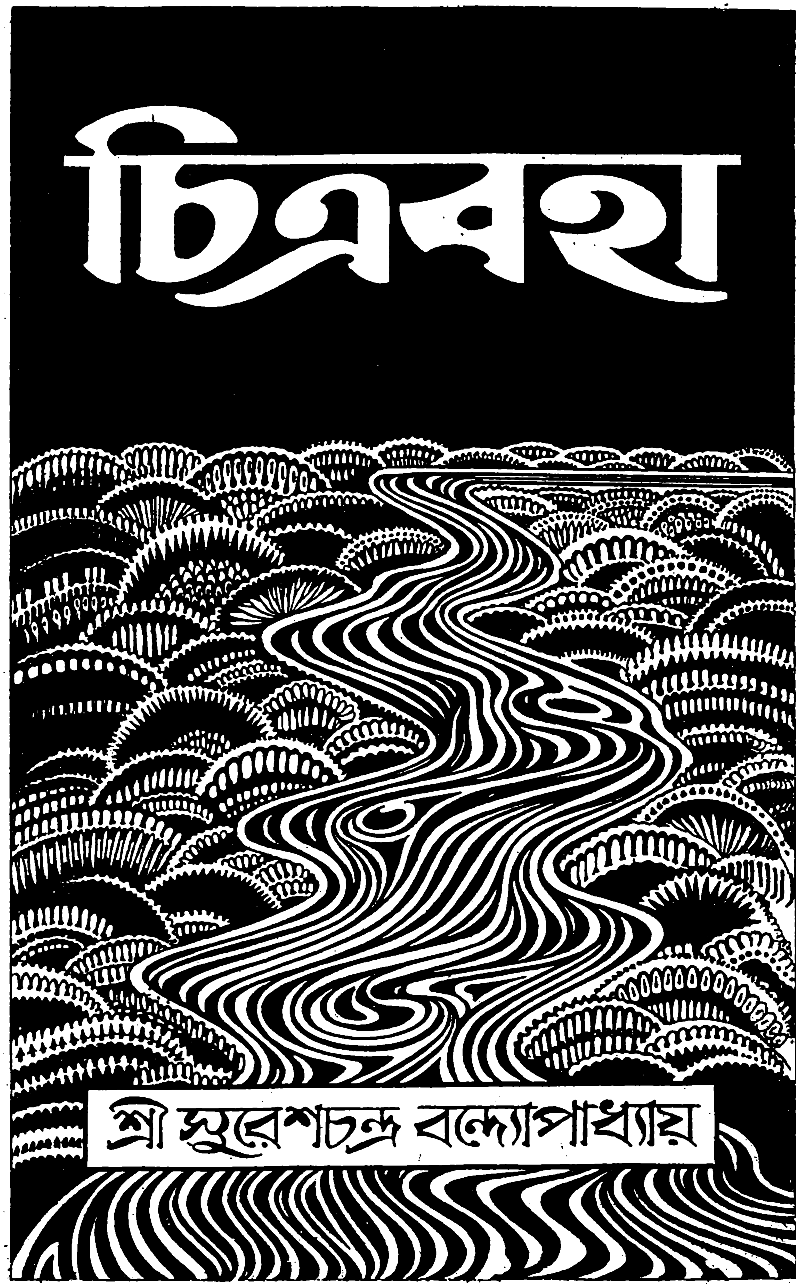

- বইয়ের প্রচ্ছদের অসমাপ্ত খসড়া, শিল্পীর হস্তে লিখিত মুদ্রনের জন্য নির্দেশিকা সহ

• দীপংকর বসুর সৌজন্যে

• যতীন্দ্রকুমার সেন রচিত্রিত (রচিত + চিত্রিত) রচনার খসড়া

• দীপংকর বসুর সৌজন্যে

বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন, রাজশেখর বসু ও যতীন্দ্রকুমার সেন

- *ঋতুপর্ণ বসু*

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের নতুন পথ খুলে যায়নি ঠিকই কিন্তু দেশপ্রেমের বীজ প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল বহু মানুষের মধ্যে, সেইসঙ্গে 'গঠনমূলক স্বদেশি চিন্তা'র স্ফুরণ ও বিদেশি দ্রব্য বয়কটের সূচনাও দেখা গিয়েছিল। এই চিন্তাধারা থেকেই হেমেন্দ্রমোহন বসু স্থাপন করেছিলেন এইচ বোস অ্যান্ড কোং যার অন্যতম জনপ্রিয় উৎপাদন ছিল 'কুন্তলীন' কেশ তৈল এবং 'দেলখোস' সুগন্ধী। 'কনজিউমার প্রডাক্ট' চালু করার জন্য বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব সেকালের এ দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন হেমেন্দ্রমোহন। শুধু উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মানই নয়, দ্রব্যের গুণাগুণ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য উন্নতমানের বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনাও করেছিলেন তিনি। বিজ্ঞাপন যুক্ত হতে থাকল কবিতা, ছড়া, নাটকীয় সংলাপ, সর্বোপরি ছবি। এইচ বোসের বিজ্ঞাপনের ছবি প্রথমে আঁকতেন নামজাদা চিত্রকর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও তারপরে হেমেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র হিতেন্দ্রমোহন বসু।

ইতিমধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও রাজশেখর বসু তাতে যোগ দিয়েছেন। অনতিকাল পরেই ঐ সংস্থার প্রচার পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি শুরু করলেন বিজ্ঞাপন প্রণয়নের কাজ, ছবি এঁকে সে বিজ্ঞাপনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ যিনি পরে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দিয়েছিলেন।

বেঙ্গল কেমিক্যালের বহু কাজের মধ্যেও যে কাজটি করে রাজশেখর অত্যন্ত আনন্দ পেতেন তা হল সংস্থার নব উৎপাদিত পণ্যগুলির বাণিজ্যকরণ ও প্রচার। নানা পণ্যের নামকরণ তিনি নিজে করেছেন। সেখানে তিনি উদারভাবে বিচিত্র সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন- অশ্বন (অশ্বগন্ধার মূল থেকে প্রস্তুত), উষসী (ভোরের আলোর মতো কোমল), রাকা (চাঁদের আলো), দাঁড়ি কামানোর সাবান, মারকিট (অর্থাৎ, মারো কীট—জীবাণুনাশক) ইত্যাদি।

এখন আমরা যাকে 'বাংলিশ' বলি অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজি মেশানো জগাখিচুড়ি ভাষা ... রাজশেখর ছিলেন তার এক সার্থক নির্মাতা। IODOLEP (Iodine + প্রলেপ) ও BOROLEP (Boric Acid + প্রলেপ) নাম দুটি এর সার্থক উদাহরণ।

বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারত তথা বাংলার বিজ্ঞাপনের জগৎ প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। বিজ্ঞাপন শিল্পকে প্রাণবন্ত করার ক্ষেত্রে রাজশেখরকে অন্যতম পথিকৃৎ বলা চলতে পারে। শুধু 'কপি' লেখাই নয়, তাঁকে একসময় ইলাস্ট্রেশনের কাজও করতে হয়েছে। 'কপিরাইটার' ও 'ভিশুয়ালাইজার' এই দুটি সত্তারই বিরল যুগলবন্দী তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে গিয়ে রাজশেখর উপলব্ধি করেছিলেন যে তাতে সরসতা আনতে হবে। বিজ্ঞাপন যেন চিত্রহীন নীরস গদ্যমাত্র না হয়। বিলাতি বিজ্ঞাপনের আদলে তিনি ভাষা ও ছবি ব্যবহার করলেন। তাঁর 'কপি' হত সরস ও সহজ যা সরাসরি মনকে আপ্লুত করত। আদর্শ কপির এটাই তো বৈশিষ্ট্য। রাজশেখরই প্রথম রবীন্দ্ররচনার পঙক্তি বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেন যেমন "কখন ফুটলো কমল আমি দেখি নাই" অথবা "শরতে আজ কোন অতিথি এল তোমার দ্বারে"। তিনি প্রথম বিজ্ঞাপনে হিউমারকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের সিরাপে জনপ্রিয় সচিত্র বিজ্ঞাপনের মর্মার্থ ছিল : প্রচণ্ড গরমে যখন বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেতে বাধ্য হয়, তখন শুধুমাত্র বেঙ্গল কেমিক্যালের সিরাপই আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। এ বিজ্ঞাপন চিত্রে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি কেঁদো রয়েল বেঙ্গল টাইগার গোরুদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করে পুকুর থেকে জল খাচ্ছে।

রাজশেখরের এসব চিন্তাভাবনার রূপকার ছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। তাঁর মধ্যে এক সুযোগ্য সহকর্মীকে খুঁজে পেলেন রাজশেখর। যতীন্দ্রকুমার গভঃ আর্ট কলেজে পড়েছিলেন, চেয়েছিলেন Landscape Painter হতে । কিন্তু রাজশেখরের প্রেরণাতে তিনি হয়ে উঠলেন বিশুদ্ধ কমার্সিয়াল আর্টিস্ট। পরে যতীন্দ্রকুমার এ কথা স্বীকারও করেছিলেন—"আমি এই সবকিছুর জন্য রাজশেখরের কাছে ঋণী। বেশির ভাগ আইডিয়া ও উপদেশ তিনিই দিতেন। এমনকি প্রাথমিক বা খসড়া ড্রইংগুলিও তিনি করে দিতেন, আমি শুধু তাকে চূড়ান্ত রূপ দিতাম।" যতীন্দ্রকুমার চিত্রিত বিজ্ঞাপনসম্ভারের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি: স্প্রে পারফিউম

গৌরী, সুগন্ধী ক্যাস্টর অয়েল, শিশুদের মাখবার 'সিপ্রা' সাবান, কোল্ড ক্রিম অফ রোজেস, ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল, গোল্ডেন স্যান্ডেল সাবান, উষসী ট্যালকম পাউডার। বিজ্ঞাপন ছাড়াও তিনি লেবেল ডিজাইন, প্যাকেজিং ডিজাইন, পাবলিসিটি ফোল্ডার, পোস্টার ও ক্যালেন্ডারের কাজ করেছেন। নানান লেটারিংএর কলাকৌশলও তিনি রাজশেখরের কাছ থেকে শিখেছিলেন। এই দুই সৃষ্টিশীল মানুষের যৌথ প্রয়াস ভারতীয় বিজ্ঞাপনের জগতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। অচিরেই বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনগুলি পাঠক ক্রেতাদের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

১৯৩৪ অক্টোবরে বেঙ্গল ক্যেমিক্যালের তৎকালীন পরিচালকবর্গ যতীন্দ্রকুমারের প্রয়াসকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন। রাজশেখরের মতে, বাল্যকালে তিনি কিছু পদ্য লিখেছিলেন বটে, কিন্তু সৃষ্টিশীল লেখা বলতে যা বোঝায় তার প্রকৃত প্রয়াস শুরু হয় বেঙ্গল ক্যেমিকেলে যোগ দিয়ে। মূল্যতালিকা তৈরী ও বিজ্ঞাপনের বয়ান লেখাকে যদি সৃষ্টিশীল কাজ বলা যায় তাহলে উপরোক্ত 'সৃষ্টিশীল' কাজের মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্যরচনার হাতেখড়ি হয়েছে - এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যজীবনে প্রথম পদক্ষেপ যেগল্পটির মাধ্যমে হয়েছিল সেই ''শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'' গল্পটি কর্মস্থলে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। গল্পটি লেখার মূলে ছিল একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা। বিশশতকের গোড়ার দিকে একদল অসাধু শেয়ারহোল্ডার বেঙ্গ ল কেমিক্যালের স্বত্ব কিনে নেবার চেষ্টা চালিয়ে অসফল হয়। গল্পটি লেখা হয় ১৯২২ সালে, সেই গোলযোগের অধ্যায়ের অব্যবহিত পরেই। প্রথম গল্পটিই গল্পকারকে খ্যাতি এনে দেয়। অতঃপর 'পরশুরাম' ছদ্মনামের অন্তরালে থেকে রাজশেখর স্যাটায়ারধর্মী আরো অনেক গল্প লেখেন। গল্পের অলংকরণের দায়িত্ব অবধারিতভাবেই এসে পড়ে তাঁর সুহৃদ ও শিষ্য যতীন্দ্রকুমারের কাঁধে। তিনি ছবি আঁকতেন 'নারদ' নামে। পরশুরাম ও নারদের যৌথপ্রয়াস বাংলা রসসাহিত্যে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল যা আজও অনন্য।

■তথ্যসূত্রঃ সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'এক্ষণ'
পত্রিকা (১৯৩০) শারদীয় সংখ্যা ও
বেঙ্গল কেমিক্যাল শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ

দেহলতা এলাইয়া দিল

আগমনী

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে!
আনন্দগান গারে হৃদয়
আনন্দগান গারে!

* *

শস্যক্ষেতের সোনার গানে
যোগ দেরে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে ॥

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা

বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন — যতীন্দ্রকুমার চিত্রায়িত

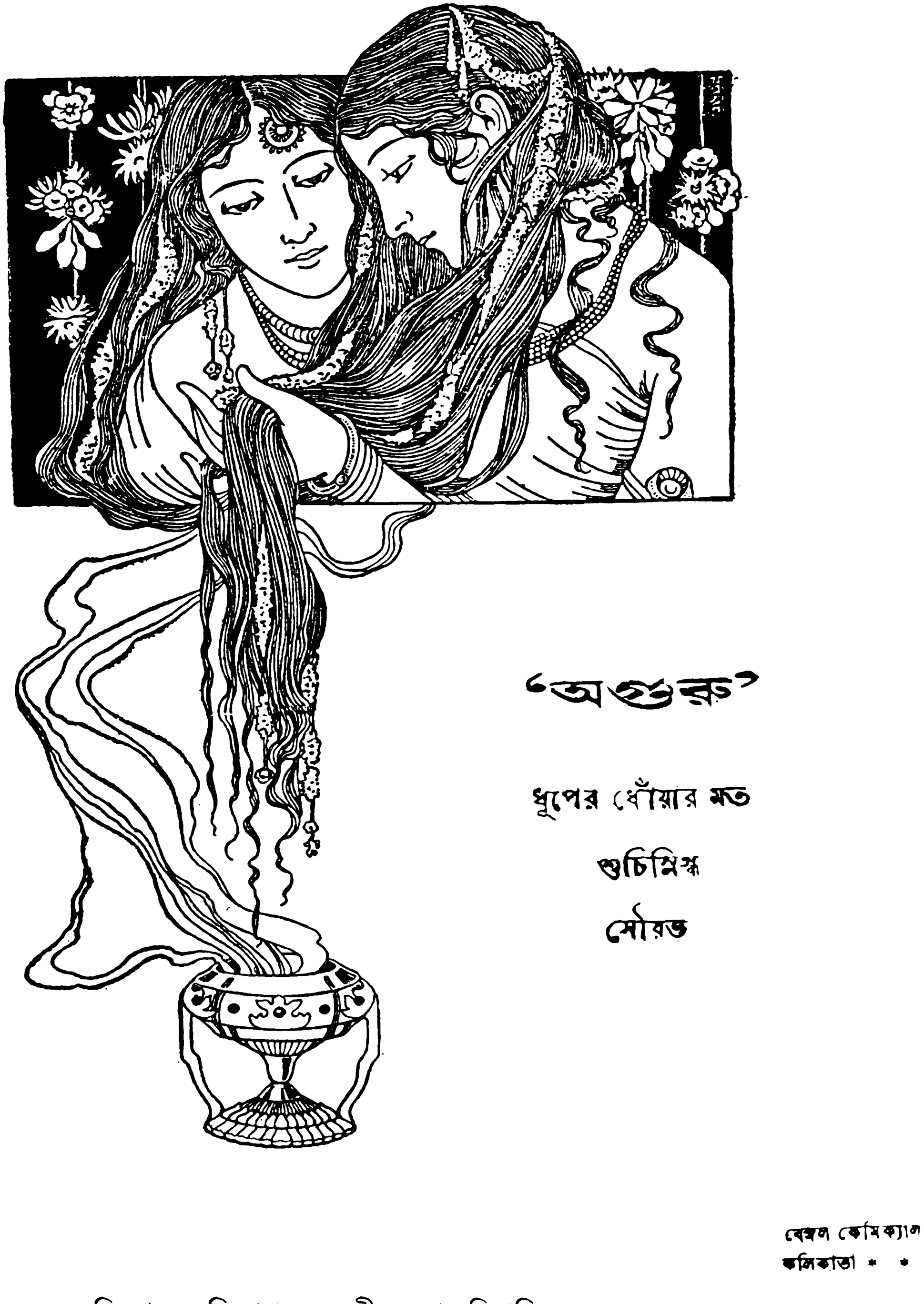

বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন – যতীন্দ্রকুমার চিত্রায়িত

প্রসাধনের ডালি

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক

'কমপ্লেকসন বাম' ॥০
'কোল্ড ক্রীম অব রোজ'
'পার্ল পাউডার' ।০

সুগন্ধি

'অগুরু' ৷৶০
'ও-ডি-কলোন' ॥৶০
গোলাপ জল ১৲

কেশ-তৈল ও প্রসাধক

'নব পুষ্পল' ১৲
'পুষ্পল' ১৲
'ক্যান্থারাইডিন অয়েল' ১৲
'রোজ পমেড' ।৶০

দন্তমঞ্জন

'এন্টিসেপ্টিক টুথ পাউডার' ।৶০
'কার্ব্বলিক টুথ পাউডার' ৶১০
'রদফেন' টুথপেস্ট ॥৵০

বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন – যতীন্দ্রকুমার চিত্রায়িত

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা । * *

স্নানের পূর্ব্বে 'পুষ্পাল' ব্যবহার করুন

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা

বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন – যতীন্দ্রকুমার চিত্রায়িত

১৪নং
পার্শিবাগানের আড্ডা
দুই সেন মহাশয় ও একটি
কার্টুন

১৪ নং পার্শিবাগান লেন ... বসু পরিবারের চার ভাই — শশীশেখর, কৃষ্ণশেখর, রাজশেখর এবং গিরীন্দ্রশেখর। এই বাড়িতেই বসল চমৎকার এক আড্ডা, প্রথমে নাম ছিল 'আরবিট্রোরি ক্লাব' অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী সমিতি। রাজশেখর সেই নাম পাল্টে নতুন নাম দিলেন 'উৎকেন্দ্র সমিতি' অর্থাৎ খামখেয়ালী সমিতি। এই আড্ডার তথাকথিত সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন। জমজমাট এই আড্ডায় স্বহস্ত নির্মিত চা পরিবেশন করতেন সভাপতি স্বয়ং। 'উৎকেন্দ্র সমিতি'র আড্ডাধারীরা নিজেদের 'আড্ডিল' বলে অভিহিত করতেন। পরশুরাম তাঁর অধিকাংশ গল্পের রসদ সংগ্রহ করেছেন এই আড্ডা থেকে। তাঁর গল্পে ১৪ নং পার্শিবাগান হয়েছে ১৮'নং হাবসীবাগান। এছাড়া বহু ব্যবহৃত ''ছাই বুঝেছ'' শব্দটি এই আড্ডা থেকেই উদ্ভূত। এই আড্ডার অন্যতম সদস্য লেখক ও কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় ও পরে লেখক গোপাল হালদার নিজের স্মৃতিচারণে সেই আড্ডার গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। স্বয়ং যতীন সেন ১৩৬১-৬২ সালে কথাসাহিত্যে এই আড্ডার মনোরম ধারাবিবরণী দিয়েছেন। কারা আসতেন সেই আড্ডায়?

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা লিখেছেন: ''প্রতিদিনই মজলিস বসিত, জমজমাট হইত রবিবার, বৈঠকখানা গম গম করিত, সেদিন সকলের ছুটি। সেই বৈঠকে কত ডাক্তার, কত অধ্যাপক, কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক, কত শিল্পী, কত ঐতিহাসিক উপস্থিত থাকিতেন তার ইয়ত্তা নাই। তার নামকরণ করা হইয়াছিল 'উৎকেন্দ্রক সমিতি'। প্রথমে একটা ইংরেজি নামই ছিল, বাংলা নামটি দেন রাজশেখর বাবু। সেই মজলিসে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে চলিত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি রবিবার বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি একসঙ্গে দুপুরবেলা সেই মজলিসে উপস্থিত হইতাম। আড্ডাধারী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন। তিনি প্রতিদিন দুপুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার হাতের তৈয়ারি চা আড্ডার একান্ত উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ ভার আর্টিস্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এ দায়িত্ব কাহারও উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার তৃপ্তি ছিল না।

এই বৈঠকে জলধরদা নিত্য আসিতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডক্টর দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু কখনও কখনও আসিতেন। পাটনার অধ্যাপক রঙীন হালদার ছুটি পাইলেই পার্শিবাগানে সমুপস্থিত হইতেন। ক্যাপটেন সত্য রায়ের পিতা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলেই এখানে আসিতেন। আরও অনেকে থাকিতেন যাঁহাদের সহিত সাহিত্য বা অধ্যাপনার কোনো সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাঁহারা গল্প এবং কথাবার্তায় আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। জলধরদা অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কানে না যায় এমন সব কথার আলাপ যখনই জমিয়া উঠিত তখনই দাদা বলিয়া উঠিতেন, 'অ্যাঁ কি বলছ ভাই?' মজাদার কথা কদাচিৎ তাঁহার কান এড়াইয়া যাইত।''

আড্ডার অনেকেই তাঁকে 'সনাতন দাদা' নামে অভিহিত করতেন। জলধর সেন আড্ডাঘরে প্রবেশ করে ফরাসের একপাশে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতেন। খানিকটা পরেই তাঁর ঝিমুনী এসে যেত। জলধর দাদার হাত-পা টেপার দায়িত্ব সানন্দে পালন করতেন ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে সেটি ছিল 'নিখরচায় পুণ্য সঞ্চয়'। জলধর সেন তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক, তিনি আড্ডিলদের লেখার জন্য উৎসাহ দিতেন ও সে লেখা তাঁর পত্রিকায় ছাপার প্রতিশ্রুতিও দিতেন। তাঁর এই প্রয়াসের ফলে যতীন্দ্রকুমার রচিত ও চিত্রিত 'দুরাকাঙ্ক্ষা' গল্পটি 'ভারতবর্ষ'-এ ছাপা হয়। এ গল্পের নায়ক ছিলেন উৎকেন্দ্রের এক আড্ডিল প্রাণতোষ। গল্পে তার নাম পাল্টে 'জীবনকৃষ্ণ' করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে খেপাবার জন্য তাঁর হুবহু রঙিন ছবি লেখাটিতে সংযুক্ত হয়েছিল। ফলে আড্ডার সবাই খুব আমোদ পেলেও প্রাণতোষ নিজে মর্মান্তিক চটে গিয়েছিলেন। এই

গল্পের আর এক চরিত্র অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার মণি রায়ের চেহারার খোলনলচে থেকে বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছিল আড্ডারই এক সদস্য সত্যিকারের অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার বিলেত ফেরত মণীন্দ্রকে দেখে।

একদিন ভরপুর আড্ডা চলছে, জলধর দাদা 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার একটি সংখ্যা নিয়ে হাজির হলেন এবং প্রসন্ন বদনে বললেন—'দেখ ভাই, তোমাদের দাদার এক ছবি এঁকে গাছে তুলে দিয়েছে।' 'শনিবারের চিঠি' সেই সংখ্যায় জলধর সেনকে একটি কার্টুনে বৃক্ষশাখায় বিচরণরত শাখামৃগ অর্থাৎ বাঁদর রূপে দেখানো হয়েছিল। আড্ডার সকলেই তাঁদের প্রিয় দাদার এই ব্যঙ্গচিত্র দেখে মর্মাহত হলেন। আর এক আড্ডাধারী কানাইলাল ছিলেন সাইন পেন্টার, তাঁর ছিল দশাসই চেহারা সঙ্গে মানানসই গোঁফ। তিনি কার্টুনের কোণে কার্টুনিস্টের নাম দেখে তাকে চিনে ফেললেন। ও অদূর ভবিষ্যতে তার ছবি আঁকা ঘুচিয়ে দেবার সংকল্প ঘোষণা করলেন।

এই ঘটনার জের টেনে যতীন্দ্রকুমার লিখেছেন: 'শনিবারের চিঠি'র দুর্বুদ্ধি প্রসূত—জলধর সেনকে বাঁদররূপে গাছে বসানো ছবি দেখে সেদিন আড্ডায় যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তা সচরাচর হয় না। এই অশোভন ও অপমানের ব্যঙ্গচিত্রে আড্ডিলরাও অপমানিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু যাঁকে নিয়ে এই ব্যাপার সেই নির্বিরোধ স্বভাবসরল মানুষটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে নির্বিকার ভাবে চুরুট টানতে টানতে তন্দ্রাতুর হয়ে পড়েছেন। বিক্ষোভকারীদের হট্টগোলে শান্তির ব্যাঘাত হতে ডাকলেন, 'ব্রেজেন, এই আটকৌড়ের কাণ্ড আরম্ভ হল কেন? গিরীনদের তক্তপোশটা দ্বারভাঙার তৈরি শাল কাঠের বোধ হয়। এখানকার সেগুন হলে এ দাপাদাপিতে টিকত না।' ব্রজেন জবাব দিলেন—'দাদা আটকৌড়ের কুলো কার ওপর ভাঙবে তার মহলা দিচ্ছে।' অতি সহজ গলায় দাদা বললেন—'থাম ভাই থাম সব। কে কি করল না করল তা নিয়ে এত হৈ-হল্লা কেন? ওহে তোমরা সব আমার বাড়িতে চল, এই দু পা। আজ আমার নাতির আটকৌড়ে, কুলোটা সেখানেই ভেঙ্গো। ব্রেজেন ওদের নিয়ে এসো। এখন একটা রিকশা আনাও।' একটা কিছু কাণ্ড ঘটেছে বুঝে পাশের ঘর থেকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন—'কি হয়েছে?' তিনি আগের কথা কিছু জানতেন না। সব শুনে বললেন—'স্থিরো ভব। বিপুলা চ পৃথ্বী।' তারপর ভগবদ্‌গীতার শ্লোক—অস্ত্র যাকে ছেদন করে না, অগ্নি দগ্ধ করে না ইত্যাদি সংস্কৃত বলতে বলতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

'শনিবারের চিঠি'র এই অসম্মানকর ব্যঙ্গচিত্রের জবাব দিয়েছিল উৎকেন্দ্র সমিতি—বিশেষ সমারোহে তাঁকে সম্বর্ধনার সঙ্গে মানপত্র দিয়ে আর সেইসঙ্গে উৎকৃষ্ট খদ্দরের ধুতিচাদর, তালতলার চটি ও তাঁর প্রিয় একবাক্স বর্মা চুরুট। আড্ডিলরা যথাসাধ্য দাদার গুণকীর্তন করলেন।

■ তথ্যসূত্র
• উৎকেন্দ্র সমিতি—শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা (কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬০)
• রূপনারানের কূলে (২য় খণ্ড) গোপাল হালদার, এপ্রিল ১৯৭৮
• ১৪নম্বরের আড্ডা (১ম পর্ব)—যতীন্দ্রকুমার সেন। কথাসাহিত্য; আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৬১

■ সঙ্কলন ও সংযোজন : বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

◀ যতীন্দ্রকুমারের রেখায় জলধর সেন

যতীন্দ্রকুমার সেনের রচনা

কলাকুশলী পরশুরাম

পরশুরামের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন—তাঁর রসাল গল্পগ্রন্থ, অগাধ-পাণ্ডিত্য-প্রসূত বহু পুস্তকপুস্তিকা, তথ্যযুক্ত প্রবন্ধাদি, গবেষণাপূর্ণ রচনাবলি যথার্থ প্রতিভার পরিচায়ক।

কিন্তু তাঁর প্রতিভা শুধু অসামান্য ছিল না—ছিল বহুমুখী। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সাহচর্যের ফলে আমি তার অতুলনীয় গুণের যেসব পরিচয় পেয়েছি তার মধ্যে কয়েকটি পরিচয় দিচ্ছি। যেমন তাঁর ছিল যান্ত্রিক বুদ্ধি তেমনই ছিল চিত্রবিদ্যায় অপরূপ দক্ষতা। এই বহুমুখী প্রতিভার একটি নিদর্শন দিয়ে আমার মূল বক্তব্য আরম্ভ করব।

এ-কথা অনেকেই হয়তো জানেন যে রাজশেখর বসুর যান্ত্রিক বুদ্ধি ও কলাবিদ্যার সমন্বয়ে বাংলা অক্ষরের গঠন সংস্কার, মাপবৈষম্য সংশোধন এবং যুক্তাক্ষরের জটিলতার সরলীকরণ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ঐকান্তিক সাহায্যের ফলে লাইনোটাইপের বাংলা মুদ্রণ সহজসাধ্য হয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র স্বর্গত স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে সহযোগিতার অনুরোধ পেয়ে তিনি নিঃস্বার্থভাবে এই লাইনোটাইপের কাজে হাত দিয়েছিলেন।

চিত্রশিল্পে রাজশেখর বসুর যে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল অনেকেই তা জানেন না। তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর চরিত্রগুলির চিত্ররূপ ও তাদের বিশেষত্ব তাঁর মনে যেভাবে দেখা দিয়েছিল সেসব তিনি স্কেচ করে ও লিখে যেভাবে আমাকে জানিয়েছিলেন সেসব আমি জনসাধারণকে উপহার দিচ্ছি।

পরশুরামের সাহায্যেই আমি ছবিগুলো এঁকেছিলাম। 'ভুশণ্ডির মাঠ'-এর সমস্ত স্কেচ তাঁর নিজের, তাই দেখে পরে আমি আঁকি। 'মহেশের মহাযাত্রা'র পেন্সিল স্কেচ, রামায়ণের ছবির কয়েকটি কালির স্কেচ, এমনকি রামায়ণের পৃষ্ঠা ছাপায় যা দাঁড়াবে তার হুবহু একটি ছবিও তিনি এঁকে দিয়েছিলেন। 'প্রেমচক্র'র সমস্ত ছবি তাঁর নিজের আঁকা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রামায়ণ ছাপায় লাইনগুলি কতখানি জায়গা নেবে এবং আশেপাশে কতখানি জায়গা থাকবে তা নির্ভুলভাবে এটিতে দেখানো আছে। এই রামায়ণের জন্য দশখানি পেন্সিল স্কেচ তাঁর নির্দেশমতো আমি করেছিলাম, কিন্তু ব্যয়বাহুল্য বোধে শেষে এই সংলাপ পরিত্যক্ত হয়।

'গড্ডলিকা'র মলাটের পরিকল্পনা তাঁর, আঁকা আমার। 'ধুস্তুরীমায়া ও অন্যান্য গল্প', রামায়ণ, মহাভারতের মলাট এবং আরও কয়েকটি বইয়ের মলাট পরিকল্পনা ও আঁকা তাঁর।

এইবার পরশুরামের বইয়ের কথা ছেড়ে বিজ্ঞাপনের ছবি ও ভাষার কথা কিছু বলব। তিনি যে কোম্পানির জন্য প্রাণপাত করে গেছেন সেই কোম্পানির প্রসাধন ও অন্যান্য দ্রব্যের ছবিযুক্ত যেসব বিজ্ঞাপন একসময় বার হয়েছিল, সেসব তখন লোকে আগ্রহের সঙ্গে দেখতেন। অনেক বিজ্ঞাপনের ছবির পরিকল্পনা তাঁর, আঁকা আমার। পরে তাঁরই প্রদর্শিত পথে আমি অনেক বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকেছি।

তখনকার দিনে তাঁকে বিজ্ঞাপনের নতুন স্রষ্টা ও পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকদের কাছে তাঁর চিত্র-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আরো কিছু বলছি। রাজশেখর তাঁর পিতার ফটোগ্রাফ থেকে পেন্সিলে এমন ভাবে এঁকেছিলেন যে, সে ছবি ফটোগ্রাফের চেয়ে নিখুঁত এবং সুন্দরতর হয়েছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কীর্তি যেমন অক্ষয়, চিত্রবিদ্যাতেও তাঁর শক্তি অপরিসীম।

শিল্পীর চোখ ও অনুভূতি নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। যেকোনো বয়সের নরনারীর আকৃতি-প্রকৃতি, চালচলন, ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা—এমনকি পশুপাখি, গাছপালা, ফলফুলের বিশেষত্বটুকু পর্যন্ত তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে কখনো এড়াত না। আমি ছেলেবেলা থেকে ছবি এঁকে আসছি, তবু অনেকসময় তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির কাছে হার মেনেছি। কুঁড়েঘর, পাকাবাড়ি, কলকবজা এবং কাঠ বা পাথরের তৈরি জিনিসে তিনি এক অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পেতেন : বলতেন, '' জানো যতীন, শালিক-পাখির রং ঠিক ভাজা ছোলার মতন, শ্যামবর্ণ বাঙালির রং নতুন সেগুনকাঠের সঙ্গে বেশ মেলে। টিয়াপাখির লেজে দুটি নীল পালক আছে। মুসুর-ডালের চেহারা অতি সুন্দর—গহনায় বসানো যায়।'' এমনকি, কাকের রূপ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। বলতেন, ''কাকের বর্ণসুষমা চমৎকার। ওপরটা কালো, নীচে ছাইরং—বর্ণশাস্ত্রসম্মত সমাবেশ। অধিকাংশ রং ও গড়ন স্বভাবজাত কিছু-না-কিছু জিনিসের তুলনায় এসে পড়ে। মোরগের রূপ অতি সুন্দর। হলে হবে কি, লোকে খেয়েই শেষ করে দেয়। তার চেয়ে পুষলে

অনেক ভালো করত।" ... আরও যা শুনেছি এখন ভুলে গেছি।

'কচিসংসদ'-এর 'কচি'দের তিনি দেখেছিলেন এবং তিনি ছবি আঁকার সময় হুবহু বর্ণনা দিয়েছিলেন। নকুড়মামার মতো একটি লোককে শীতের রাত্তিরে ছাতা মাথায় বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায়ই যেতে দেখতেন। 'চিকিৎসা সংকট'-এর হাকিম, ডাক্তার, কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথ—এঁদের প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সময় তাঁর চোখে পড়েছে। তাঁদের তিনি ভোলেননি। তাঁরই বর্ণনায় ওঁদের ছবি আমি এঁকেছিলাম।

পরশুরামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা গতানুগতিক ছিল না। যেকোনো ছবির যেমন রসগ্রাহী তেমনি তীক্ষ্ণ সমালোচক। এক সময় তাঁর প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারের জন্যে ছবির বিষয়বস্তু তিনি বলে দিতেন। কয়েকটি আঁকবার পর একটি পছন্দ হত। একবার মেঘদূতের ছবি হল, চাষার মেয়েরা মেঘ দেখছে। মেঘ কীরকম হবে তাও নিজে এঁকে দেখিয়ে দিলেন। রং দিয়ে ছবি আঁকা হল। দেখে বললেন, "বদ। কালিদাসের চাষার মেয়ে এরা নয়। সিনেমা-আর্টিষ্ট। অন্য লোকের পছন্দ হবে।" কর্ণ-কুন্তীর ছবিতে কর্ণের সহজাত কবজকুণ্ডল তাঁর মতে বুকের ওপর জড়ুলের মতো মোটা মাংস, কানে মাংসের রিং। ছবিতে তাই আঁকা আছে। যক্ষপত্নী ও ময়ূরের ছবি আবার আমার নিজের শখে। যাতে ময়ূর এসে বসত সেই ফলক কী রকম হবে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, "পিঁড়ে—স্ফটিকের পিঁড়ে"। লোকে ভুল করে দাঁড়ের ডাণ্ডার মতো আঁকে তাঁর মতে রামায়ণের রাবণের দশমুণ্ড ও দশহাত সহজাত নয়। রাবণ মুকুটের মতো করে দশ মুণ্ড পরতেন এবং চারটি করে পূর্ণাঙ্গ হাত কাঁধের দুদিকে ঝোলাতেন—আকার ভীতিপ্রদ করবার জন্যে। বনবাসে গিয়ে রামের দাড়ি গোঁফ ছিল, ফিরে এসে নাপিত ডেকে কামিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকে রামের দাড়ি-গোঁফ-কামানো বনবাসের ছবি দ্যাখে।"

একবার দার্জিলিং থেকে তাঁর সঙ্গে রেলে কলকাতায় ফিরছি। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে দেখতে আসছি — সূর্য ডুবছে, আভা পাহাড়ের চূড়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। দেখছেন আর বলছেন, "18 Carat Gold"। পরমুহূর্তে বলছেন, "14 Carat—এইবার 9 Carat Gold, শেষে যেন তাঁবা।" সূর্য ডুবে গেল, হিমালয় মিলিয়ে গেল।

আমার দুরাকাঙ্খা ছিল—ফটোগ্রাফার, Landscape painter, কিংবা Figure designer হবার। তিনি বলেছিলেন, "প্রথমটায় তোমার পয়সা হবে না। কারণ তুমি চাও ফটো—হবে চিত্রকলা। Landscape অল্পলোকই আদর করে। এখন কমার্সিয়াল আর্টিস্টের বড়ো দরকার। একবারে সব হবে। লেবেল, পোস্টার, নিউজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট —এসব পাবে।" কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি, অক্ষরবিন্যাস ও লেবেল আঁকার হাতেখড়ি তাঁর কাছেই আমার হয়েছে। আমি আগে অক্ষর লিখতে পারতাম না।

ফটোগ্রাফিতেও তাঁর খুব ভালো হাত ছিল। সস্তা ক্যামেরায় তিনি সুন্দর ছবি তুলতে পারতেন। একজন মানুষের মধ্যে একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ সচরাচর নজরে পড়ে না। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তিমতো যথাসাধ্য বর্ণনা দিলাম। দিনের পর দিন তাঁর কাছে থেকে এতসব মূল্যবান কথা শুনেছি যার সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে গেল একখানি মোটা বই হয়।

আমি অপরকে দিয়ে লেখাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তিনি আমার সামনে বসে আছেন। কী প্রশান্ত প্রতিভাদীপ্ত মুখ! হাতের আঙুলগুলি যেন ছবির রেখার ওপর খেলে বেড়াচ্ছে অনায়াস-সুলভ সাবলীল গতিতে।

কলা চ দীর্ঘা স্বল্পঞ্চ আয়ুঃ। আমার শিল্পগুরু, বুদ্ধিগুরু, সাহিত্যগুরু রাজশেখর—পরশুরাম, তোমাকে প্রণাম করি!

রাজশেখর বসুর স্কেচ হইতে
লেখক কর্তৃক অঙ্কিত

■ 'বসুধারা' পত্রিকা
আষাঢ়, ১৩৪৭

বালকাণ্ড

১। নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ

বেদজ্ঞ তপস্বী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নারদকে মুনিবর বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান্, বীর্যবান্, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত; যিনি সদাচারী, সর্বভূতের হিতকারী, বিদ্বান্, কর্তব্যপালনে সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন; যিনি আত্মসংযমী, কান্তিমান্ জিতক্রোধ ও অসূয়াশূন্য?

রাজশেখর বসুর সচিত্র পাণ্ডুলিপি

[illegible] দুই চরিত্রের স্কেচ — রাজশেখর বসু অঙ্কিত

প্যাক্টু

মুরারি মণ্ডল এবং কিফায়েত খাঁ এক গ্রামের বাসিন্দা। মুরারি চৌকিদার। কিফায়েত গৃহস্থ চাষি; জমিদারের বৃত্তিভোগী লাঠিয়াল। দুজনের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব। গানের শখ খুব। কোনও বড়ো শহর থেকে এদের গ্রাম কাছে নয়। জমিদার বাড়িতে ব্যাটারি দেওয়া রেডিও ও গ্রামোফোন আছে। কাজের জন্য জমিদার বাড়িতে বা ওদিকে গেলে, যদি রেডিও বা গ্রামোফোন শুনতে পায়, নিজেদের কাজ ভুলে সেখানেই বসে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে যখন বোঝে আর বসে থাকলে চলবে না, তখন উঠে পড়ে।

জমিদার বাড়িতে পাল-পার্বণে কবির গান, যাত্রা ও সময় সময় থিয়েটার হয়। পাল-পার্বণের ব্যাপার ছাড়া জমিদার ভুবন চৌধুরী মাঝে মাঝে অনেক খরচ করে কলকাতা থেকে ভালো ভালো ওস্তাদ আনিয়ে গানের আসর বসান। এই জমিদারের চরিত্র দোষ নেই। রুচি মার্জিত। অবস্থা ভালো। গান-বাজনা খুব ভালোবাসেন। মুরারি ও কিফায়েত কখনও কোনও গানের আসরে অনুপস্থিত থাকে না। আহার-নিদ্রা, কাজকর্ম ত্যাগ করে মশগুল হয়ে বসে থাকে।

দিন যায়। কিফায়েত চাষবাস করে, মুরারি চৌকিদারি করে বেড়ায়। কিফায়েত যে-কোনো কাজ করে, গান গায়। সুর তাল কিছুরই ধার ধারে না। মনের আনন্দে কাজের সঙ্গে গান গেয়ে যায়। মুরারিও তাই করে, কিন্তু মুস্কিল বাধায়। চৌকিদারি করতে বেরোলেই তাকে এমন গানে পেয়ে বসে যে, সব ভুলে যায়; নিজের কাজ পর্যন্ত। দিনের বেলায় কিছু যায়-আসে না; কিন্তু রাত্তিরে চোর-ছ্যাঁচড়রা তার গানের আওয়াজ দূর থেকে পেয়েই গা ঢাকা দেয়। মন্দলোকদের সকলকেই প্রায় মুরারি জানে। গানের বদ অভ্যাসের জন্য ধরতে পারে না। কেউ যদি হঠাৎ ধরা পড়ে যায়, তাহলে তার নিগ্রহের সীমা থাকে না। তাকে মারতে আরম্ভ করে আর বলে—'দ্যাখ ব্যাটা হারামজাদা এসব মন্দ কাজ ছাড়। আজ তোকে সা, রে, গা, মা, কষিয়েই ছেড়ে দোবো। ফের ধরা পড়লে বাকিটা—' বলার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী হাতের এক ভয়ানক চড় এক গালে—'এইটে হল, 'সা'। অন্য গালে আরেক চড়—এইটে হ ল, 'রে'। আর তোর পিঠে এই এক ঘা—এইটে হল, 'গা'। পাছায় আরেক ঘা—এইটে হল 'মা'। 'গা' ও 'মা' লাগাত মুরারি কোমরে বাঁধা চামড়ার কোমর-বন্ধ খুলে নিয়ে। লোকটা এই চারটে ঘায়ে এমন কাবু হয়ে যেত যে, বসে পড়ত। উঠলেই চৌকিদারি লাঠির এক খোঁচা দিয়ে মুরারি বলত, 'দ্যাখ ব্যাটা হারামজাদা, তোকে এবার ফাঁড়িতে দোবো না। সাত হাত নাকখত দিয়ে বাড়ি যা।'' মার লাগবার সময় মুরারি বেশ ভারিক্কী চালে শুনিয়ে দিত, 'আমি জমিদার বাড়িতে গান শুনে কাওলাতির সাতটা সুর রপ্ত করেছি। তার চারটে আজ পেলি। মনে করে রাখবি।'

গ্রামের রায়বাবুদের দিঘির পাড়ে এক অশথ গাছের নীচে বসে, দুই বন্ধুতে বসে গলা সাধে। একদিন জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত এক ওস্তাদ বেড়াতে বেরিয়ে গলা সাধা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কে হে বাপু? গানের বেজায় শখ দেখছি।' দুজনে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে নিজেদের পরিচয় দিলে। ওস্তাদের ও তাঁর সঙ্গীদের অনেক বলাকওয়ায় তারা শেষ পর্যন্ত লজ্জা ছেড়ে দিয়ে বেসুরো ও বেতালা গান আরম্ভ করে দিলে। ওস্তাদ কিছুক্ষণ শুনে বললেন, 'হয়েছে, থাক। তোমাদের গলার সুরে যা পেলাম, তাতে সাধনা করলে কিফয়েত হবে—কাফিসিদ্ধ, আর মুরারি—মল্লার সিদ্ধ। গানের দুটো মস্ত সুর, কাফি ও মল্লার। আমি আরও কয়েকদিন এখানে আছি। তোমরা এই সুর দুটো আমার কাছে ভালো করে শিখে নিতে পার। কিন্তু এই দুটো সুর ছাড়া অন্য সুর গেয়ো না। পারব না। এতেই তোমাদের নাম বেরিয়ে যাবে। আমি এই জন্যে কিফায়েতের নাম দিলাম—কাফিখাঁ, আর মুরারির—মল্লার মণ্ডল। তোমরা সকলকে এই দুটো নামই আজ থেকে বলবে, ও এই নাম কেন হল, তাও জানিয়ে দেবে। দুজনে ওস্তাদকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। ওস্তাদ একটু হেসে এগিয়ে গেলেন।

ওস্তাদের শহরে ফেরার দিন, দুই বন্ধু জমিদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। মুরারি পুরোপুরি চৌকিদারি পোশাকে। ডানহাতে লাঠি; বাঁহাতে একটা মস্ত রুইমাছ। কিফায়েতের গায়ে ফতুয়া, পরনে সাজো কাচা ধুতি, তেলচুকচুকে বাবরি চুলে নতুন গামছার বেড়, কাঁধে বাঁক। এক দিকে হাড়িতে দই, অন্যদিকে কাঁচাগোল্লা। ওস্তাদ পালকিতে উঠলে, জমিদারের লোকজনের সঙ্গে দুই বন্ধু মিলে গ্রামের পথ সচকিত করে চলতে লাগল। মুরারি ছাড়তে লাগল চৌকিদারি হুংকার, কিফায়েত চেঁচাতে লাগল—'রে রে রে, তফাত তফাত।' ওস্তাদকে সসম্ভ্রমে রেলে তুলে দিয়ে, দই, কাঁচাগোল্লা ও মাছ পায়ের কাছে রেখে, দুই বন্ধু বাড়ির পথ ধরল। কিছুক্ষণ চুপচাপ চলার পর কিফায়েত বললে, 'ভাই মুরারি, আমি ওস্তাদবাবার শেখানো কাফিসুর গাইব। শোন, রেলের

গাড়ি ওই চলে যায়।' মুরারি একটা গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা, হিন্দি গান বিকৃত ভাষায় গেয়ে উঠল—ধুংকরী গাড়ি উড়িয়ে লিয়ে যায়। আসল গানটা ছিল, 'ধুঁয়ে কি গাড়ি উড়ায় লিয়ে যায়।'

ওস্তাদ তামাশার ছলে এই দুই বন্ধুর গলার তারিফ করে ও বাহবা দিয়ে যে খেপিয়ে গেলেন, তা এরা বুঝতে পারলে না। ফলে বিষম উৎসাহে গানে মেতে গিয়ে কিফায়েত ও মুরারি যখন-তখন যে-কোনো জায়গায় কাফি ও মল্লার সুর নিজেদের মনগড়া করে সাধতে লাগল। একদিন, গাঁয়ের জন তিনেক লোক দিঘির পাশ দিয়ে যেতে তাদের গানের কসরত শুনে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি ভাই মুরারি ওস্তাদ হবে নাকি? যে রকম লেগেছ'—মুরারি বাধা দিয়ে বললে, ' আমার নাম ওস্তাদমশাই রেখে গেছেন—মল্লার মণ্ডল। আমি আর মুরারি নই।' কিফায়েতকে জিজ্ঞাসা করতে, 'কি ভাই তোমারও কি ওস্তাদ বনে যাওয়ার মতলব? ব্যাপার কী ?' কিফায়েত ধমক দিয়ে বললে, 'চোপ। ওস্তাদ গুরুমশাই আমার নাম দিয়ে গেছেন—কাফি খাঁ। আমাকে আর কিফায়েত নামে ডাকবে না।' বলার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করে দিলে — 'দা-দারা-দাদাদা'। মুরারি যোগ দিল—'রি রি রি, মারি রিসা রিসা।' লোকেরা সরে পড়ে পাড়ায় রটিয়ে দিলে, কিফায়েত ও মুরারির মাথা গানের বিঘোরে পড়ে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। ওরা সুর করে কি সব বলছে। অনেকে শুনে বললে, 'তাই ত এমন ভালো মানুষ দুটো কি খেপে গেল।'

জমিদারমশাই বৈঠকখানায় আলবোলার নল হাতে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব চা খাচ্ছেন ও গল্প করছেন। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে ঘর ভরপুর। ভুবন চৌধুরী চা খান না। ভোরে উঠেই নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, সদ্যদোয়া পাঁচপো খাঁটি গোরুর দুধ গরম গরম খেয়ে বাইরে এসে বসেন। নানা বিষয় আলোচনা চলে—ভালো ফসল, অজন্মা, গানের নতুন রেকর্ড, কার গান বার বার শোনবার মতো, হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট, সি.আর. দাশ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি।

সেদিনের বৈঠকে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট নিয়ে হরেকরকম কথাবার্তা ও মতামত চলছে, এমন সময় দারোয়ান রসভঙ্গ করে এসে দাঁড়াল, বললে, 'হুজুর, মধু, হরদাস ঔর ছকৌড়ি, তিন রাত ভেট করেন আয়েঁ হেঁ। জরুরি বাত কুছ হ্যয় বোলতে হেঁ।' আলোচনায় রসভঙ্গ হওয়ায় বন্ধুরা বিরক্ত হলেন 'এই সকালে এদের জরুরি বাত বলবার কি এমন দরকার হল?' এখন যেতে বলে দাও দারোয়ানজি।' ভুবন চৌধুরী দারোয়ানজির কথা শুনলেন না। লোক তিনটিকে ডাকতে বললেন। তারা এলে, ওদের মধ্যে মাতব্বর প্রজা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে হরিদাস, এমনকি জরুরি কথা যার জন্যে একেবারে তিনজনে আমার কাছে এলে?' সকলেই একসঙ্গে বলবার চেষ্টা করতে, ভুবন চৌধুরী হাত তুললেন 'একে একে বল।' হরিদাস আরম্ভ করলে, 'হুজুর, কিফায়েত খাঁ আর মুরারি মণ্ডল এদের দুজনের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে । হরিদাস আরও কিছু বলবার চেষ্টা করতে সকলে তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'বড়ো আশ্চর্য কথা! গতকাল রাত্তিরে মুরারি নিয়মিত সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ও চৌকিদারি হাঁক পাড়তে পাড়তে রোঁদ দিয়ে গেছে, আমরা অনেকেই তো শুনেছি, আর কিফায়েত গতকাল সকালে ধানের পাকা হিসেব দিয়ে গেছে ও বাঁওড়ে মাছ ধরবার বিলির কথা জানিয়ে গেছে। আমরা কেউ তাদের কথায় বা চালচলনে মাথা খারাপের কোনও লক্ষণই তো দেখিনি, তবে লোক দুটো কি রাতারাতি খেপে গেল?'

হরিদাস বললে - 'তাহলে হুজুররা শুনুন। কর্তাদিঘির পাড় দিয়ে ভিনগাঁয়ে যাবার সময় দেখি মুরারি ও কিফায়েত হাতমুখ নেড়ে কাওলাতি গানের নকলে কি-সব গাইছে। শুধোতে বললে 'দেখ হরিচাচা তোমরা আমাকে এখন থেকে কাফি খাঁ বলে ডাকবে। বাপজানের দেওয়া আগের নাম আমার এখন নেই। ওস্তাদ গুরুমশাই আমার গানের বিদ্যে দেখে ঐ নাম রেখে গেছেন। শোন—দা, দারা, দাদা, দা। মুরারি কাছে এসে কিফায়েতের মতন বিকট সুর কবে— রিরি রি, মা রি, রি মা, রিসা এই সব বচন গলা কাঁপিয়ে আওড়াতে আরম্ভ করলে, আর জানালে আমি এখন মুরারি মণ্ডল নই, মল্লার মণ্ডল। ওস্তাদমশাই-এর দেওয়া নাম। এই নামেই আমাকে সবাই ডাকবে। তোমরা আমাদের গলাসাধার ব্যাঘাত কোরো না। এখনও সুর ভাঁজবার অনেক বাকি। নিজেদের কাজে যাও। এই বলে চৌকিদারি হাঁকাড়ার মতন আরম্ভ করে দিলে— রি রি রি—। তাদের ভাবগতিক দেখে আমরা আর দাঁড়ালাম না। বরাত সেরে রেতেরবেলা ঘরে ফিরে ঠিক করলাম, হুজুরকে এদের কথা না জানালেই নয়। তাই এলাম। ভুবন চৌধুরী বললেন, 'এতে খেপে যাবার কি দেখলে? মনের আনন্দে গান গাইছে। কারও কিছু অনিষ্ট করছে না। কাজকর্ম যেমন করবার ঠিক তেমনি ভাবেই করে যাচ্ছে। ওস্তাদের তামাশা সত্যি বলে ধরে নিয়ে নিজেদের নাম বদলে ফেলেছে কালোয়াত হবার দুরাশায় পড়ে। ও কিছু নয়। দুদিন পরই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা বাড়ি যাও।' এক বন্ধু বললেন, 'শোন হরি মোড়ল, ওদের গানে পেয়েছে। যেমন লোকেদের ভূত-পেতনিতে পায়। কালোয়াতির ভূত ওদের ঘাড় থেকে নেমে গেলেই ওরা আগের মতন হয়ে যাবে।'

দিঘির পাড়ে প্রচণ্ড উদ্যমে গলা সাধা চলতে লাগল। গাঁয়ের লোকে পারতপক্ষে ওদের ঘাঁটায় না। ঘাঁটালেই মুশকিল।

কালোয়াতি শুনতে হবে। একদিন মুরারি একটু দেরিতে এল। কিফায়েত প্রতিদিনের মতো উবু হয়ে বসে একটু গলা সাধছে। মুরারি বললে, থাম দিকি একটু কাফি ভাই। আজ বাঁধা বটতলার মজলিসে শুনে এলাম হিঁদু-মোছলমানে প্যাক্‌টো হয়ে গেছে, কলকাতায় ও অন্যান্য সব জায়গায়। এটা আমাদের এই গাঁয়ে এইবার আরম্ভ হবে। এর জন্যে শহর থেকে বড়ো বড়ো বাবুরা সব আসবে, প্যাক্‌টো চালু করতে। এই প্যাক্‌টো কী কিছু জানো ভাই? কিফায়েত জবাব দিলে, 'তা আর জানিনে। অনেক দিন আগেই ওকথা শুনেছি। তুমি যে কেন শোননি জানি না। আচ্ছা, তবে বলি শোন—প্যাক্‌টো যখন চালু হবে, তখন হিঁদু-মোছলমান গলায় গলায় হয়ে যাবে; যেমন তুমি আর আমি আছি। কিন্তু বাবুরা আরও যে সব কথা বলছে সে সব কি করে হবে বুঝতে পারছি না।' মুরারি জিজ্ঞাসা করলে, 'সে সব কী কথা?'

কিফায়েত আরম্ভ করলে, 'এই ধরো হিঁদু-মোছলমানে জল ছোঁয়াছুঁই থাকবে না। একপাতে সবাই খাবে। আমাদের মসজিদে তোমরা যাবে, তোমাদের মন্দিরে আমরা। আমি কোপ-মারা গোস্ত, আর তুমি হালাল করা গোস্ত খাবে। এমনকি শাদি-বিয়াও আরম্ভ হবে।' মুরারি রেগে গেল— 'এ কখনও হতে পারে না। জাতধম্ম বলে তাহলে কি কিছুই থাকবে না?' কিফায়েত বললে, 'রাগলে চলবে কেন?' বাবুরা যখন এসব চালাবে, তখন তোমার-আমার কথা শুনবে কি?' মুরারি বললে, 'বাবুরা হুজুগ চায়। হিঁদু দারোগা বাবুকে তুমি তো মাঝে মাঝে মুরগি রান্না করে খাওয়াও। নুকিয়ে-চুরিয়ে যেমন চলছে চলুক না ওসব প্যাকটোর দরকার কি?' কিফায়েত জবাব দিলে, 'কি জানো ভাই তোমাদের একজন বড়ো স্বদেশি নাকি বলছে—নুকিয়ে-চুকিয়ে কিছু না করে খোলাখুলি ভাবে সব করো। এতে সকলকার ভালো হবে। মুরারি জ্বলে উঠল, 'এসব ইংরেজের কারসাজি। প্যাকটোর নাম করে আমাদের জাত মারবার চেষ্টা করছে। একসঙ্গে বসি, দাঁড়াই, গান গাই, আপদে-বিপদে একজোট হই, আমাদের দুজনে কত ভাব। বাবুদের কথায় এই তো প্যাকটো। নয় কি?' কিফায়েত বললে, 'দুচার জনকে নিয়ে কথা হচ্ছে না। সবাইকে নিয়ে কথা-কিফায়েতকে বাধা দিয়ে মুরারি গর্জে উঠল, 'ওসব চলবে না। হিঁদু-মোছলমানে বিয়ে, মাংসর বিচার নেই, জল ছোঁয়াছুঁই নেই, মন্দিরে ঢোকবার বাধা নেই, আর কি নেই?' কিফায়েত উঠে মুরারিকে লাগালে এক চড়। বললে, 'ওসব মানতেই হবে, নইলে তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার কাটান-ছাড়ান হয়ে গেল।' মুরারি এর জন্য তৈরি ছিল না। আচমকা চড় খেয়ে রেগে উঠে সেও লাগাল পাল্টা এক চড়। চড়ের আগে, রিরিরি, মারি, বলে সুর ছেড়ে দিলে, কিফায়েত পাল্টা দিলে, দা, দারা, দাদা, দা। কয়েক মিনিট এই রকম চলবার পর দুজনেই চেঁচিয়ে উঠল—'ক্ষেমা দে ভাই, ক্ষমা দে।' হাতাহাতি থেমে গেল।

দিঘির পাড়ে দুজনে আবার পাশাপাশি বসে মত প্রকাশ করলে,—'কাজটা ভালো হল না।' মুরারি বললে, 'হুঁ।' কিফায়েত সায় দিল—'হুঁ'।

দুজনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে সমস্বরে বলে উঠল, 'তাহলে প্যাকটোর কী হবে?'

কিফায়েত ও মুরারির মুখ থেকে এক সঙ্গে বার হল,

'জাহান্নামে যাক!' 'চুলোয় যাক!'

কয়েক মিনিট পরে কিফায়েত শুরু করলে, 'দা— দারা— দাদা—দা।' মুরারি গলা ছাড়লে, 'রিরিরি—মারি —রিমা —রিসা।'

■ **'মৌচাক', অগ্রহায়ণ ১৩৬১ থেকে পুনঃমুদ্রিত**

• অপ্রকাশিত ছবিতে পেচকদম্পতি

• দীপংকর বসুর সৌজন্যে

ল্যাজ ও ল্যাজুড়

ল্যাজ বিধাতার হাতের কারিগরির এক আশ্চর্য নমুনা। ওটি যে শুধুই পশুপাখিদের অঙ্গশোভা তা নয়, তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির, অঙ্গমার্জ্জনের এবং মনোভাব-প্রকাশের প্রধান উপকরণ। ঐ ল্যাজের বৈচিত্র্যেই সিংহ পশুরাজ, ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রাচার্য্য, বেড়াল-বেড়ালি বাঘের মেসো এবং মাসি, শেয়াল পণ্ডিতধূর্ত আর পক্ষিকুল কাক চতুর-চূড়ামণি।

বীরত্ব প্রকাশ করবার সময় মানুষ যেমন তর্জ্জনী তাড়না করে, এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে, কুকুর-বেড়াল-প্রভৃতি পশুরাও তেমনি লাঙুল বা ল্যাজ আস্ফালন করে অর্থাৎ আছড়ায়। আবার ভয় পেলে মানুষ গুটোয় হাত-পা, পশু গুটোয় ল্যাজ। অবশ্য মানুষের ল্যাজ থাকলে, সেও তাই-ই গুটোত; নেই বলেই তাকে অপর অঙ্গের শরণ নিতে হয়। কেননা, মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ- এটি হচ্ছে শাস্ত্রীয় বিধি।

বিশেষ বিশেষ কাজে ল্যাজ কীরূপ গুরুতর সহায়, ভেবে দেখা উচিত। বেড়াল বাচ্ছাকালে আপনার ল্যাজ ধরে শিকার শিকার খেলা করে, ভবিষ্যতে শিকারি হবে বলে, আর বুড়ো হলে ল্যাজ গুটিয়ে উনানের ধারে বসে তপস্যা করে, মোক্ষ লাভের আশায়। কুকুর ল্যাজে-মাথায় এক করে কুণ্ডলী পাকায়, আয়েসের সাগরে সাঁতার কাটবার উদ্দেশ্যে; গবাদি পশু ল্যাজ ঝাড়ে, মশা-মাছি তাড়াবার জন্য; ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করে, আনন্দে নৃত্য করবার ইচ্ছায়; আর কুকুর ল্যাজ নাড়ে প্রভুর ঘাড়ে আরোহণ করবার সাধু অভিপ্রায়ে। সুতরাং ল্যাজ যে ওদের মনোভাব জানাবারও দর্পণস্বরূপ, তার সন্দেহ নাই।

এই বার ক্যাঙারুর ল্যাজের কথা চিন্তা করুন। দেখুন, অশ্বের নাড়ির সঙ্গে ওর কি আশ্চর্য সাদৃশ্য ! ওরই ওপর ভর করে সে হন্‌হন্ করে ছুটে চলে, ঘোরে-ফেরে, আবার স্থির হয়ে বসে, কাৎ হয়ে শোয়।

কোনো-কোনো জানোয়ারের ল্যাজে অমৃত আছে কি-না, ঠিক জানা নেই; তবে বিষ যে আছে, তা প্রত্যক্ষ। কাঁকড়া-বিছের ল্যাজ, ভিমরুলের ল্যাজ এবং কোনো-কোনো সাপের ল্যাজ- এর ভীষণ জ্বালাময় জ্বলন্ত সাক্ষী।

আবার শোনা যায়, আমেরিকার জঙ্গলে এক প্রকার সাপের ল্যাজে ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টাকর্ণের ইতিহাস অবশ্য পুরাণ প্রসিদ্ধ; ওরা কেন যে ঘণ্টাকর্ণের অবতার না হয়ে ঘণ্টালাঙ্গুল হ ল, সে এক বিষম সমস্যা। বৈজ্ঞানিকরা ওদের সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, ওর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কোনো নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে অনুমান করা যায়।

ব্যাঙের ল্যাজ নেই, কিন্তু ব্যাঙাচির আছে। বর্ষাকালে ব্যাঙেরা খালবিলের ধারে দল বেঁধে কাঁদতে বসে কেন জানেন? ঐ ল্যাজের বিরহে। কেউ কেউ বলেন, তারা কাঁদে না — গান গায়। ও-কথা সর্ব্বৈব মিথ্যে — অত দুঃখে কেউ কখনো গান গাইতে পারে?

টিকটিকির কিন্তু ল্যাজুড়-বিরহ নেই, কেন না তার ল্যাজুড় খসে গেলেই গজায়। যতবার খসে ততবার গজায়। দশাননের মাথারও ঠিক অমনি ধারা গজাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তাঁর মাথার সঙ্গে টিকটিকির ল্যাজের খুব নিকট সম্বন্ধ থাকা সম্ভব।

ব্যাঘ্রাচার্য্য

(শিকার ধরবার সময় ল্যাজের ডগাটি এধার-ওধার করে)

তারপর, ল্যাজ যে অঙ্গের শোভা, তা বুঝাবার জন্য আমাদের বেশি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। Birds of Paradise আমরা স্বচক্ষে না দেখে থাকলেও তার ছবি আমরা সবাই দেখেছি; ময়ূরের পেখম ধরা দেখা গেছে, আর দেখা গেছে ঘোটকীর ল্যাজ। শুনা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোটকীবিশেষের পুচ্ছ, অর্থাৎ ল্যাজের শোভা দেখেই 'ক্ষুধিত পাষাণে' অপ্সরীর কেশদামের কল্পনা করেছিলেন; নইলে ও-বস্তু তাঁরও স্বচক্ষে দেখে আসার সম্ভাবনা অল্প।

এইবার বানরের ল্যাজের বিষয় আলোচ্য। বানরের ল্যাজের সঙ্গে-সঙ্গেই অবশ্য হনুমান, বনমানুষ এবং রাক্ষস-খোক্কসের কথা মনে হয়। বানরের কুলতিলক হনুমান যে সীতা-উদ্ধারের প্রধান সহায় হতে পেরেছিলেন, তার কারণ ঐ অভ্রভেদী ল্যাজ। ল্যাজের বলেই তিনি সাগর ডিঙিয়ে রাক্ষস রাজকে সর্ষপ-পুষ্প দেখিয়ে, লঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন। লঙ্কাদগ্ধের সময় তাঁর ল্যাজের বহর কীরূপ ছিল, শ্রবণ করুন,

"কুপিত হইলা বীর পবননন্দন।
বাড়াইয়া দিলে ল্যাজ পঞ্চাশ যোজন।"

পঞ্চাশ যোজন যে ব্যাপারখানা কি, তা আপনারা খড়ি পেতে আঁক না কষলে, ঠিক বুঝতে পারবেন না। তারপর ঐ ল্যাজে ত্রিশ মণ ওজনের কাপড় জড়িয়ে, ঘি ঢেলে আগুন দেওয়া হয়—

"মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন ল্যাজে অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়ে পড়ে বীর বড়ঘরের চালে।।"

ল্যাজের বলেই যুবরাজ অঙ্গদ রাজসভায় ঢুকে দশাননের সিংহাসনের সমান উঁচু কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে, তারই দশ গালে চুন আর দশ গালে কালি মাখিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যুবরাজের ল্যাজের মর্যাদা রক্ষার জন্য এখানে তার একটু বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক :

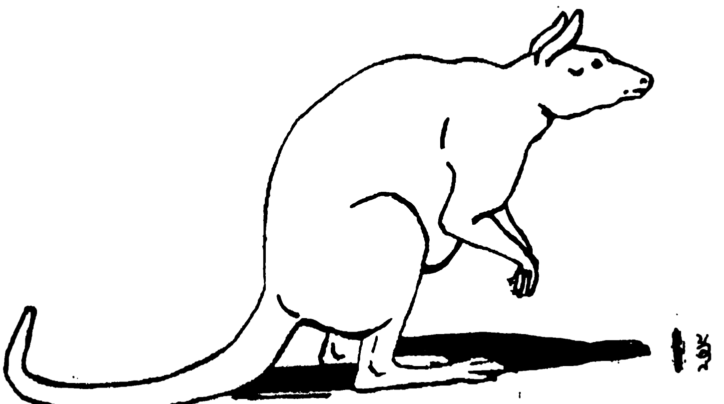

ক্যাঙারু
(ইনি ল্যাজের জোরেই চলেন)

"কুণ্ডলী করিয়া ল্যাজ বসিল সভাতে।
পুরন্দর বার যেন দিল ঐরাবতে।।
সুমেরুপর্ব্বত যেন অঙ্গদের দেহ।
রাক্ষসেরা—বলে বাপ! এটা এল কেহ।।"

পশ্বাদির ল্যাজের মহিমা শুনে এবং কতক-কতক দেখে আপনাদের দুঃখিত বা ঈর্ষান্বিত কারণ হবার নেই; কেন না পণ্ডিতরাজ দ্বারবীণ বলে গেছেন, ওটা আমাদেরও এককালে ছিল, এবং এখনও যে একবারে নেই, তা নয়; আছে, — কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হয়ে। এবং তাঁরই হেতুবাদ নিয়ে চোখ বুজে ভেবে দেখ্‌লে, এটাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাবে যে, দেবতাদেরও ওই অত্যাবশ্যক বস্তুটি সশরীরে বর্তমান।

আমরা হতভাগ্য মানুষের হ্রস্ব ল্যাজ নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নই। তাই নানা রকম বস্তু ও অবস্তুকে ল্যাজ কল্পনা করে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে থাকি। তার মধ্যে খেতাব হচ্ছে একটি। এটি অবস্তু, সুতরাং নিরাকার; কিন্তু প্রকারের বিচিত্র; যেমন — সরকারি-বে-সরকারি, স্বদেশি-বিদেশি, কেনা, দানে পাওয়া, পড়ে পাওয়া, চুরি করা, গজিয়ে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এর

মধ্যে সরকারি খেতাব যাঁদের আছে, তাঁরা আছেন কেমন তাঁদের হাল কী, চাল কীরূপ; এবং যাঁরা তা পাবার প্রয়াসী, তাঁদেরই বা কর্তব্য কিম্বিধ, তা আপনারা অনেকেই জানেন; আর মহাজনেরাও গদ্যে-পদ্যে সবিস্তারে তা লিখে গেছেন, সুতরাং ও-বিষয়ে আর আমার নতুন কিছু বলতে যাওয়া নিতান্তই বাহুল্য। তবে কথাটা যখন তোলা গিয়েছে, তখন এই সরকারি ল্যাজুড় সম্বন্ধে দুই-একটা দৃষ্টান্ত না দিলে বিবরণীটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব আপনারা অবহিত হন, আমি ল্যাজুড়-মাহাত্ম্যের দুই-একটা নমুনা দিই।

শুনেছি, এবং সত্য বলেও বিশ্বাস করি যে, এক মহাত্মা একটা ল্যাজুড়, যে উপায়েই হোক লাভ করেছিলেন। তাঁকে নাকি একজন চিঠি লিখিবার সময়, ভ্রমক্রমে — ইচ্ছা করে নিশ্চয়ই নয়, সেই ল্যাজুড়ের উল্লেখ করেননি। এই মহা অপরাধে ল্যাজুড়ধারী মহোদয় ভদ্রলোকের চিঠিখানি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; খামের উপর লিখে দিয়েছিলেন Refused, insufficiently addressed।

আবার আরেক জায়গায়, বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, কোনো রায়-বাহাদুরণী, যাদের উক্ত বা উহা হইতে দীর্ঘতর ল্যাজুড় নেই, তাদের বাড়ি নিমন্ত্রণে যেতেন না, পাছে তাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

আমাদেরই একজন পূজনীয় প্রতিবেশী ছিলেন। সাধনা-বলে তাঁর একটা ল্যাজুড় লাভ হয়েছিল। একবার এক নতুন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর গ্রামে পদার্পণ করেন। প্রতিবেশী মহোদয় দেখা করতে গেলে সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, " আপনি কে?" তিনি তখন নিজের ল্যাজুড়ের পরিচয় না দিয়ে পকেট থেকে এক কার্ড বের করে সাহেবের হাতে দেন। সে কার্ডে সরকারি ল্যাজুড়ের উল্লেখ তো ছিলই, আর ছিল, স্বরচিত একটা ল্যাজুড়; সেটা হচ্ছে এফ্-এ-এফ্। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটার মানে তো বুঝতে পারছি নে?' লাঙ্গুলধারী সগর্বে বললেন, 'ওটার অর্থ হচ্ছে, এফ-এ পরীক্ষায় ফেল।' সাহেব সদরে গিয়ে সেইবারই তার লাঙ্গুল দীর্ঘতর করে দিয়েছিলেন।

Dr. N.C.Dassero L.M.D.S. (America)

R.D.Bosa K.C.B.

মানুষের এইসব ল্যাজুড় বইবার জন্য বাহন আছে। তাদের নাম সাধুভাষায় 'সহকারী', আমাদের চলতি ভাষায় 'মোসায়েব'। তারা যখন-তখন ল্যাজুড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; কেহ ল্যাজুড়ের উল্লেখ না করে সম্বোধন করলে তখনই সংশোধন করে দেয়। এর জন্য তারা নাকি কিছু কিছু পেয়েও থাকে।

অন্য সব ল্যাজুড়ের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাদের মনোহারিত্বও কম নয়, সুতরাং তার গুণগান আমি একটু বিস্তৃত ভাবে করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

এক শ্রেণীর ল্যাজকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) শাস্ত্রীয়, (২) অশাস্ত্রীয় বা ইঙ্গ-বঙ্গীয়।

শাস্ত্রীয় ল্যাজুড়, যথা—'জ্ঞানারণ্য-বরেণ্য-শার্দ্দুল', 'জন-গণ-মন-ধনাধি-নায়ক', 'চিত্রকলার্ণব-রস-সিন্ধুঘোটক', 'কাব্য-কোকনদ-বনবিহারী-মধু-মধুপানোন্মত্ত মধুপ' ইত্যাদি।

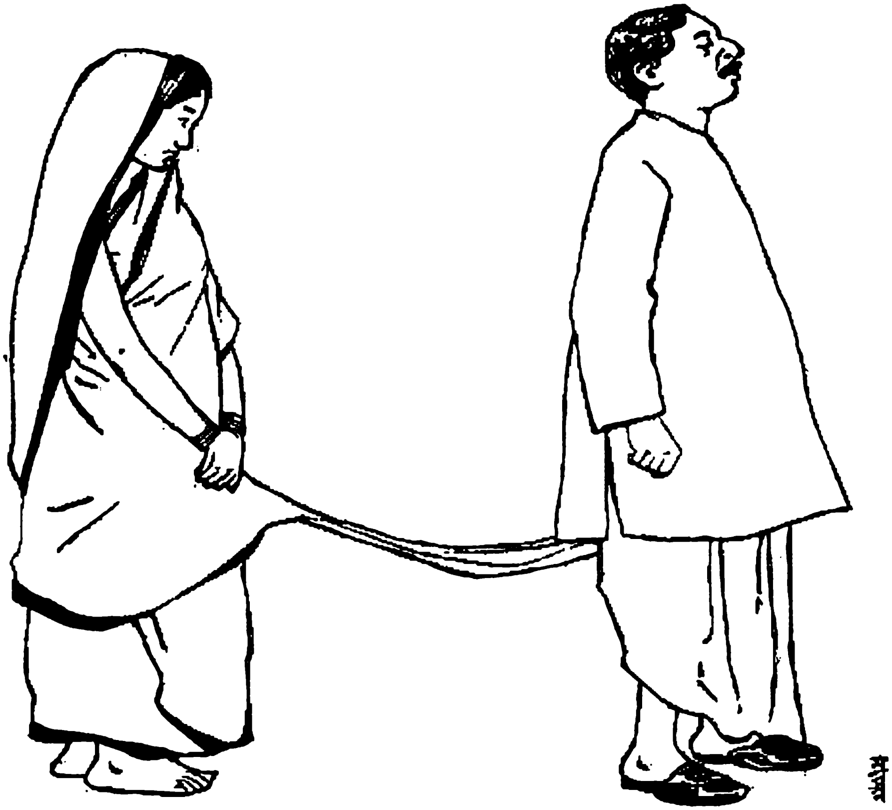

বিবাহিতের সাকার ল্যাজুড়

শ্রীমৎ চতুরানন্দ স্বামী

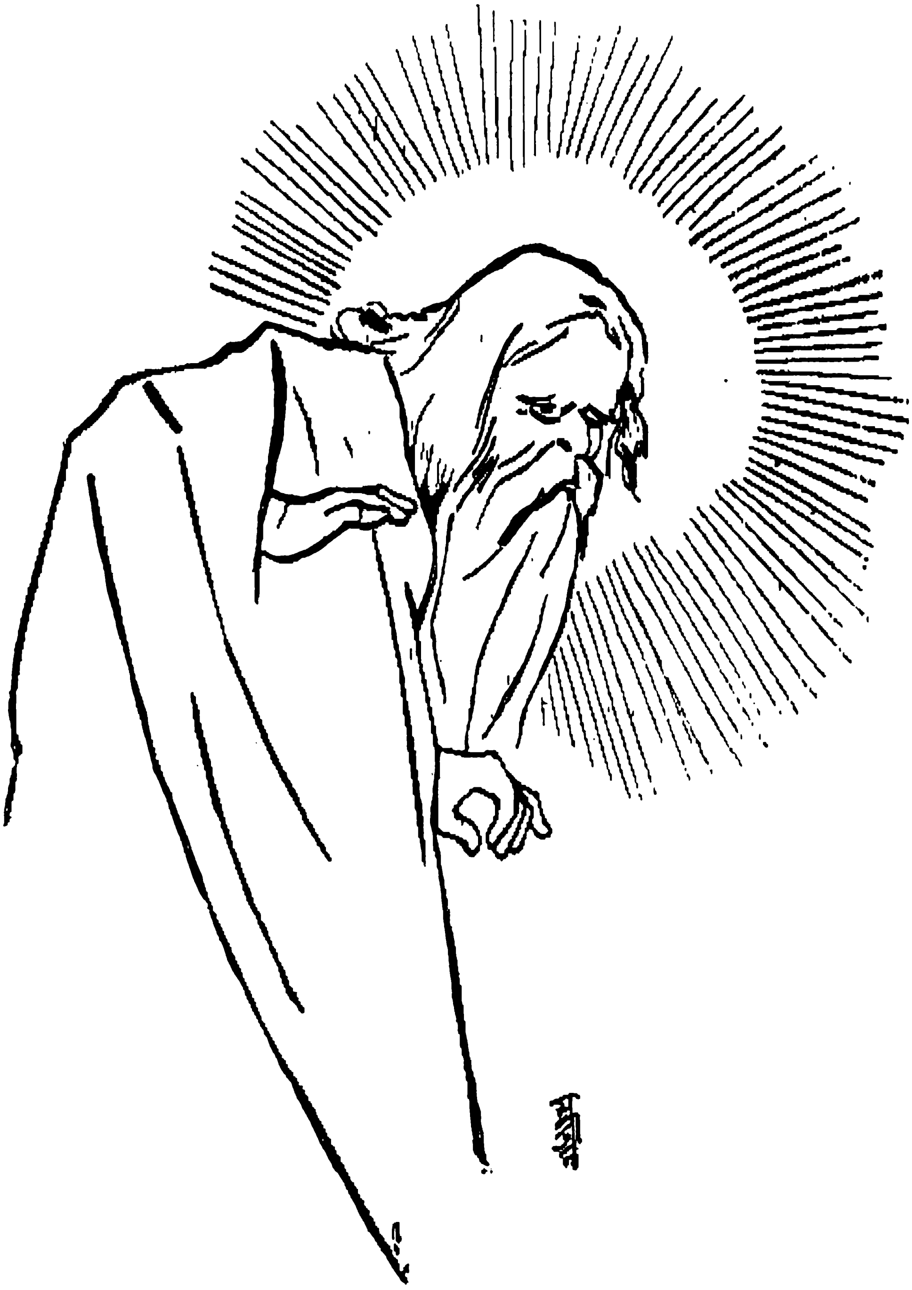

ব্রাদার তমসুকভূষণ জোয়াদ্দার **F.T.S.**

ইঙ্গ-বঙ্গীয়, যথা 'Expert', 'L.M', 'D.S.', 'P.M.C.', 'M.H.F.C.' প্রভৃতি।

উদাহরণমালা

একটি সেকেন্ড ক্লাসের ছেলের বইয়ে তার সল্যাজুড় নাম দেখা গেল, শ্রীকানাইলাল দত্ত P.M.C. P.M.C.-র মানে Pre-Matriculation class, অর্থাৎ কিনা - ছেলেটির তখনো Matric class হয়নি।

ক্রমে সাবালকদের দিকে আসুন।

শ্রীনকুড়চন্দ্র দাস। এঁর নাম ল্যাজুড় সমেত, Dr. N.C.Dassero L.M.D.S. (America অর্থাৎ Licenciate in Medicine, Doctor of Surgery)

শ্রীপদ্মরাগকান্তি তলাপাত্র—P.R.K. Tallapatra Esq; A.E., M.E. (Gr. Bt.) (Automobile Engineer And Motor Expert; Great Britain)

শ্রীরামধন বোস—R.D. Bosa, K.C.B. (কেল্‌নার কোম্পানির বাবু)

রায়সাহেব রামসত্য তালুকদার, C.C. (Confidential Clerk)

ক্ষীণেশচন্দ্র পাকড়াশী—B.C. (Bank Clerk)

ব্রাদার তমসুকভূষণ জোয়ারদার, F.T.S. (Boston Mass)—(Fellow of the Theosophical Society)

শ্রীকুমুদিকানীন্ত কর্মকার—ইনি নাম বদ্‌লে ল্যাজুড় লাগিয়ে হয়েছেন— শ্রীমৎ চতুরানন্দ স্বামী।

মিঞা বাবুল হুসেন— মালিক-ই-ফট্‌ক। ইনি একটি কারখানার দ্বাররক্ষী।

মিঞা বাবুল হুসেন, মালিক-ই-ফটক্

এইরূপ ল্যাজুড়ের আদিঅন্ত নেই—কত আর বলব? ল্যাজযুক্ত প্রাণীরা ল্যাজের সাহায্যে যা-যা করে, ল্যাজুড়ওয়ালা জীবেরাও ল্যাজুড়ের সাহায্যে তাই তাই করে থাকে। এটি তাদের মনোভাব প্রকাশ করার প্রধান সহায়।

নিরাকার ল্যাজের পরিচয় আপনারা পূর্বেই পেয়েছেন, এইবার মানুষের সাকার ল্যাজুড়েরও একটু পরিচয় নিন, না হলে পরিচয়টি সম্পূর্ণ হবে না। প্রজাপতির নির্বন্ধে বিবাহিত লোকেদের বরাতেই এটি জোটে। প্রকাশ করে বলতে হবে কি, দ্রব্যটি—বিশেষ পত্নী? বিবাহিত লোকের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, মনোভাব আরও বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির বিকাশ—সবের মূলে এই ল্যাজুড়। ক্যাঙারুর ল্যাজের মতন এটি যে ভর্ত্তাদের একটি বলবান অঙ্গ, তা প্রকাশ করে বলাই বাহুল্য।

এইখানেই পালা শেষ করতে চাই; কারণ স্থানাভাব, এবং নিরীহ পাঠকদেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তবে আমার পক্ষে ভরসার কথা এই যে—

লাঙুল-মঙ্গল কথা অমৃতসমান।
যারা যারা শোনে তারা মহা পুণ্যবান।।

- ভারতবর্ষ, ১৩২৯ (১ম মুদ্রণ)
- সচিত্র শিশির, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ (পুনঃমুদ্রণ)

: যতীন্দ্রকুমার সেনের রচনা তালিকা :

রসরচনা

১।	ক্ষণজন্মার আত্মকাহিনী	সচিত্র শিশির, ১৬ আশ্বিন, ১৩৩১
২।	ব্যাঘ্র ও সিংহ্র	শারদীয় দেশ, ১৩৬০
৩।	সিনেমাসুন্দরীর কবলে	দেশ, ১৪ কার্তিক, ১৩৬০
৪।	হাসি	দেশ, ৮ই আষাঢ়,১৩৫৮
৫।	কামিনী-কুন্তল	মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৬
৬।	ল্যাজ ও ল্যাজুড়	ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৯; সচিত্র শিশির, জৈষ্ঠ্য, ১৩৩২

গল্প

১।	দুরাকাঙ্খা	সচিত্র শিশির, বড়দিন ১৯২৪
২।	প্রতিদ্বন্দী	বসুধারা, আশ্বিন ১৩৬৪
৩।	প্যাক্ট	মৌচাক, অগ্রহায়ণ ১৩৬১

কবিতা

১।	হাঁচি	মানসী ও মর্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২৫
২।	কেরাণীর প্রেম	মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক ১৩২৮

আত্মকথা

১।	গঁওসাঘাটের বাবাজী	দেশ, ২৩শে জৈষ্ঠ ১৩৬০
২।	১৪ নম্বরের আড্ডা	কথাসাহিত্য, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ থেকে চৈত্র, ১৩৬১ বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৬২

নিবন্ধ

১।	বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ	দেশ, ১৪ পৌষ ১৩৫৭
২।	চীনের চিত্রকলা	দেশ
৩।	চীনের ব্যঙ্গচিত্র	দেশ
৪।	কাশ্মীর প্রসঙ্গ	দেশ
৫।	ব্যবহারিক শিল্পপ্রদর্শনী	দেশ

নাট্যরূপ

১। চিকিৎসা সঙ্কট

চিত্র সংকলন

১।	শিল্পী যতীন্দ্রকুমার	(১৩৩৪)

গার্হস্থ্য চিত্র—৬

চিত্রকর—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

তন্ময়

শ্রাবণ, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] নবম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

• ভারতবর্ষ পত্রিকার নানা বিভাগের শিরোনাম সহ শিল্পীর অলংকরণ

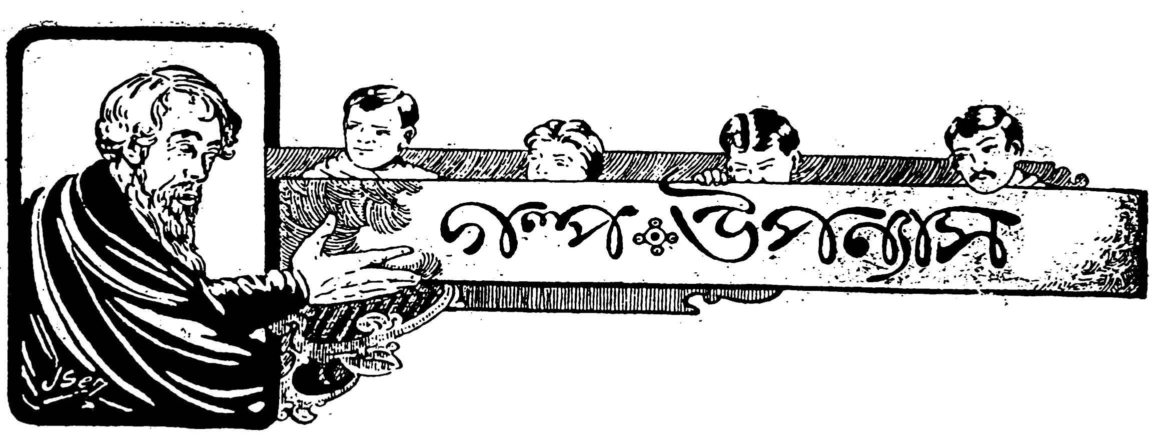

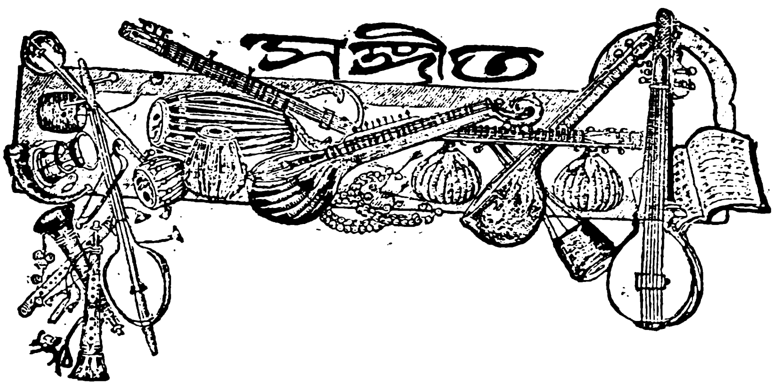

• ভারতবর্ষ পত্রিকার নানা বিভাগের শিরোনাম সহ শিল্পীর অলংকরণ

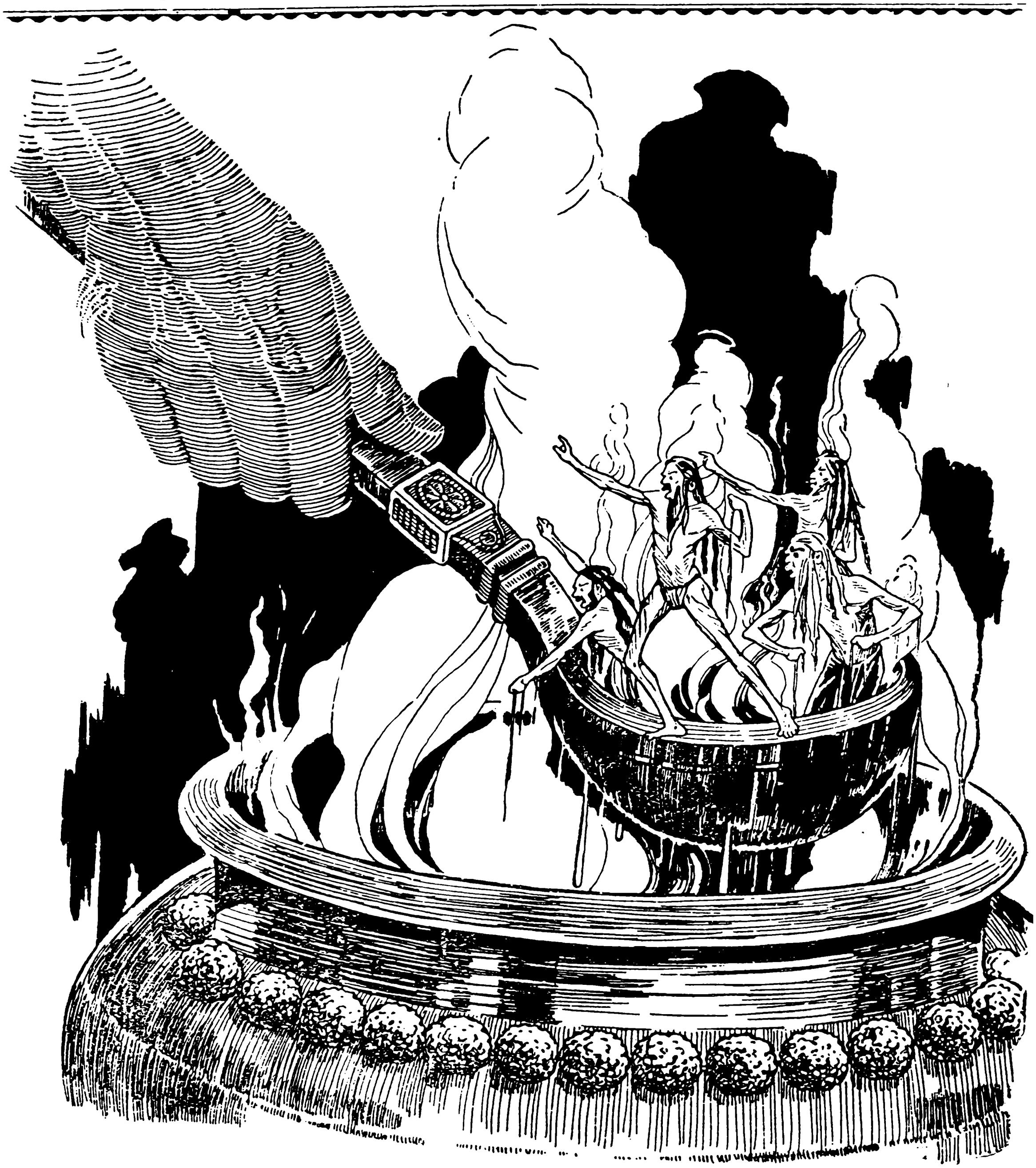

রে নারকী যমরাজ

• পরশুরামের 'জাবালি' গল্পে পূর্ণপৃষ্ঠা অলংকরণ

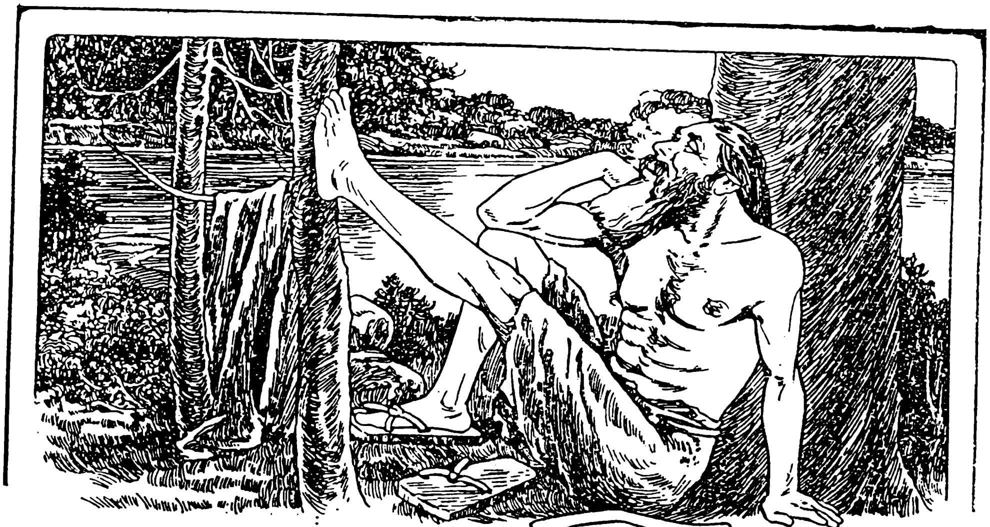

পরশুরাম রচিত **জাবালি** নারদ বিচিত্রিত

পরশুরাম বিরচিত **লম্বকর্ণ** নারদ বিচিত্রিত

• শিল্পীর সচিত্র শিরোনামাঙ্কন

• ভারতবর্ষ পত্রিকায় শিল্পীর অলংকরণ

- সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর 'বিচিত্রা'য় তাঁর লেখা *চলচিত্তচঞ্চরী* প্রথম প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রকুমার তার কয়েকটি চরিত্রের স্কেচ এঁকেছিলেন।

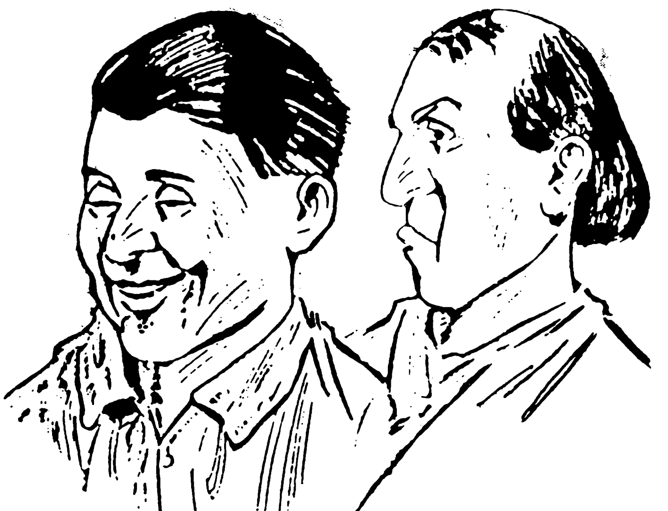

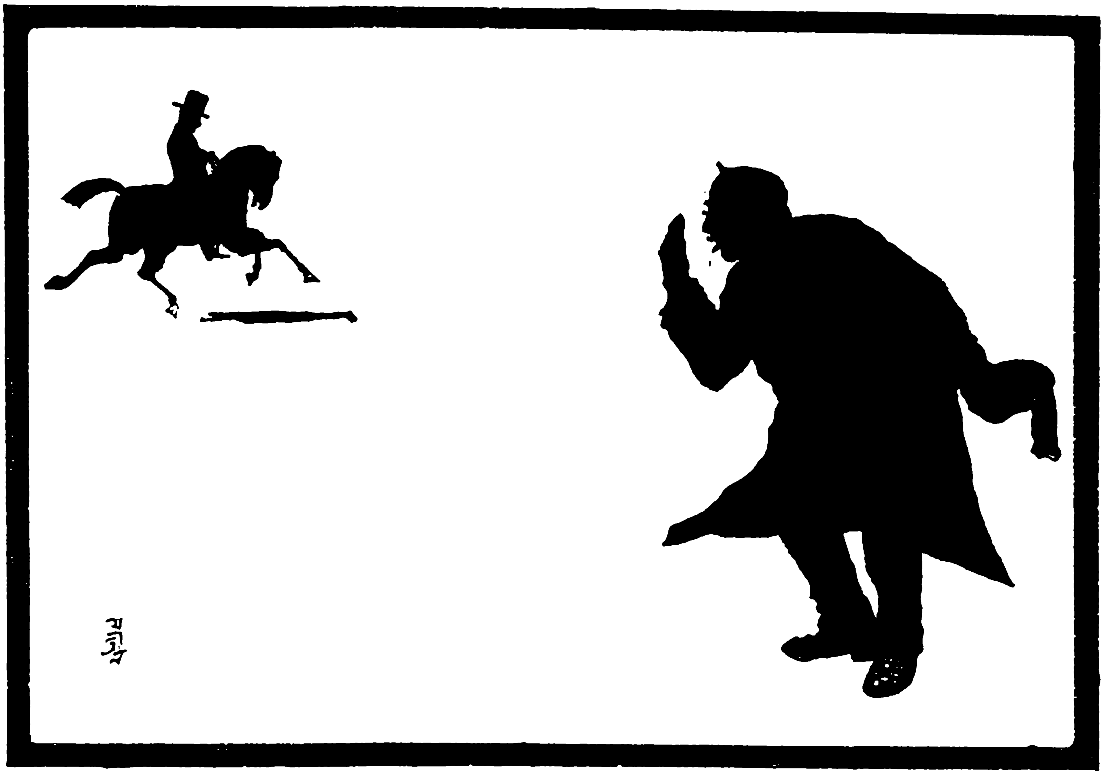

ব্যঙ্গচিত্র : রায়বাহাদুর (রাজশেখর বসুর পরিকল্পনা অনুসারে)
সচিত্র শিশির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড

ভাবী বৈবাহিকদ্বয়

ছেলের বাপ: শালা কী জোচ্চোর! / মেয়ের বাপ: ব্যাটা কী চশমখোর!

সচিত্র শিশির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড

ভারতবর্ষ

স্টীমার ও গাধাবোট

শিল্পী : যতীন্দ্রকুমার সেন

• ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩২৮ সালে প্রকাশিত কার্টুন

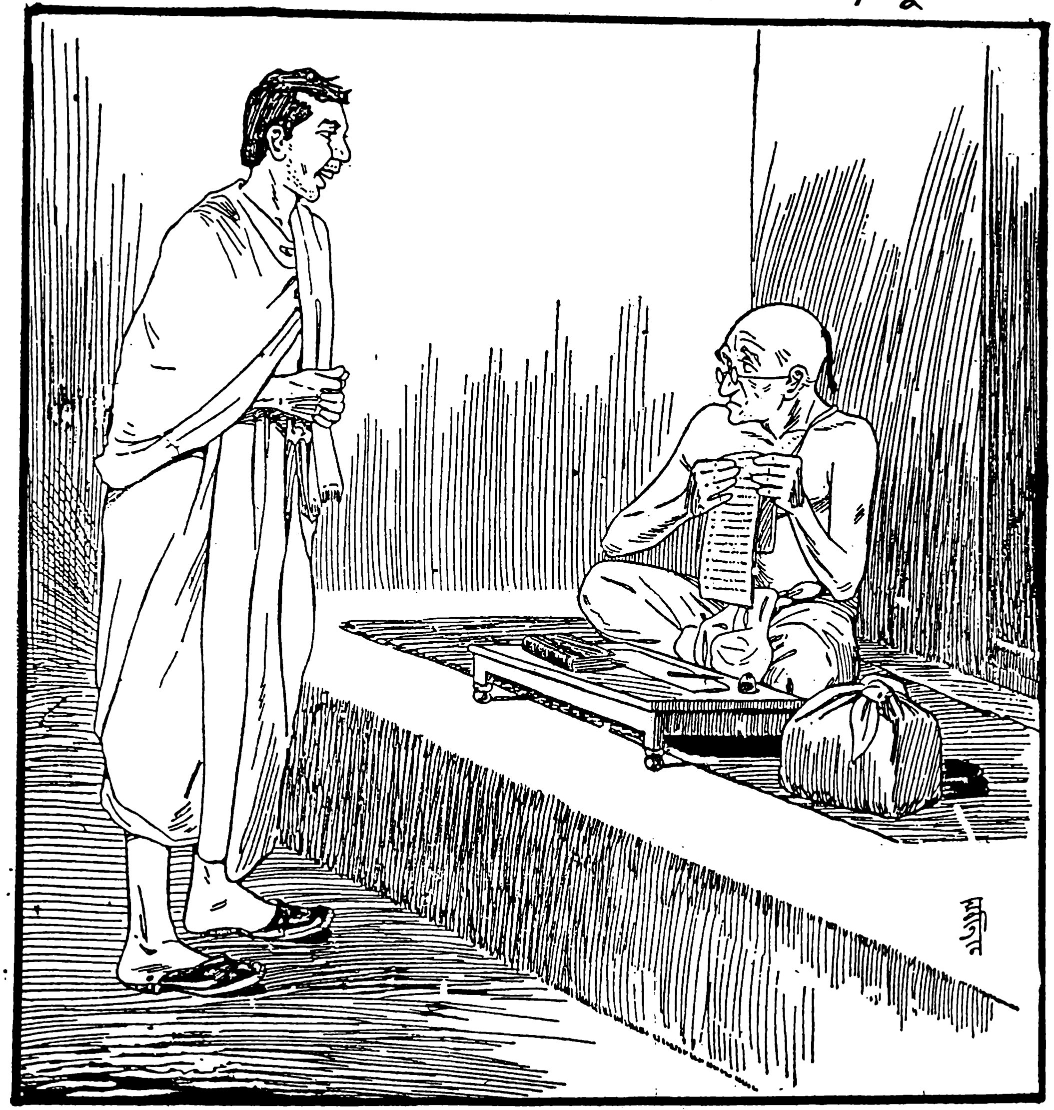

দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি !

বুদ্ধির সাহায্যে দিন শুদ্ধির ব্যবস্থা । চটীজুতো গড়ে মোর ফিরেছে অবস্থা ॥

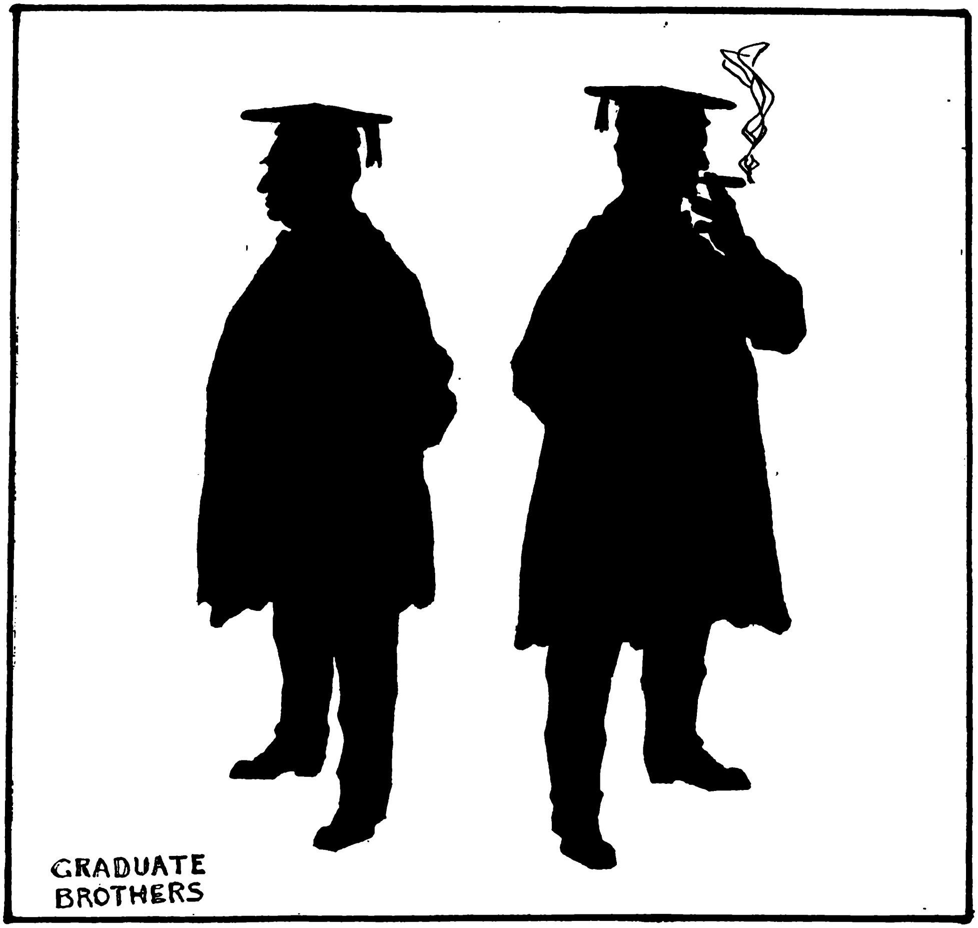

• অপ্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্র

• দীপংকর বসুর সৌজন্যে

ব্যঙ্গচিত্র : শিশুশিক্ষা ২য় ভাগ (হুঁকোসাধনা) সচিত্র শিশির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড

নারীবিদ্রোহ

কৌঁসুলি

“পলট্ দে রায় হাকিমকী
পলীডার হো তো এইসী হো”

শাড়ী সেমিজ হয়েছে যে
নিতান্ত সেকেলে;
ধুতি ও পাঞ্জাবী পর –
নইলে নিভে গেলে!

সচিত্র শিশির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড

কী সুন্দর আহা মরি, ইচ্ছে হয় বিয়ে করি।
সচিত্র শিশির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড

নারীবিদ্রোহ

উঠ প্রিয়ে মুখ ধোও পর নিজ বেশ – চায়ের বাটিতে মন করহ নিবেশ।

নারীবিদ্রোহ

সুপারিনটেন্ডেন্ট পদী পিসী –
তার under-এ কলম পিষি!

সচিত্র শিশির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড

নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর
পান সিগারেট দোক্তা ছেড়ে বর্মা চুরুট ধর।

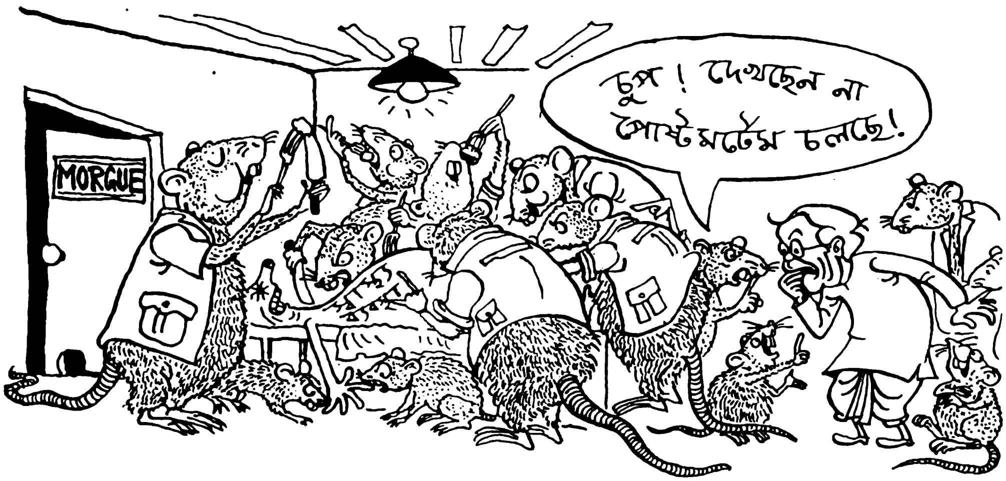

কার্টুন : ঋতুপর্ণ বসু

কি রে, নোবেল প্রাইজটা ফিরিয়ে দিতে পারলি না ...
আবার মালা দিতে এসেছিস!

কার্টুন : ঋতুপর্ণ বসু

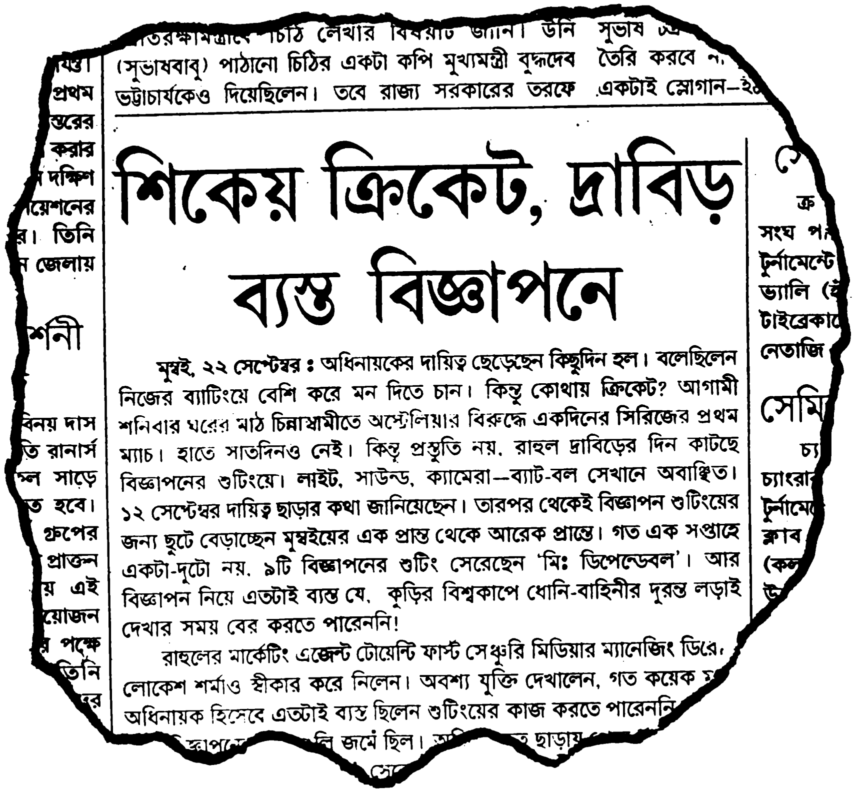

...তরক্ষামন্ত্রীকে চিঠি লেখার বিষয়টি জানান। উনি (সুভাষবাবু) পাঠানো চিঠির একটা কপি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও দিয়েছিলেন। তবে রাজ্য সরকারের তরফে ...

শিকেয় ক্রিকেট, দ্রাবিড় ব্যস্ত বিজ্ঞাপনে

মুম্বই, ২২ সেপ্টেম্বর : অধিনায়কের দায়িত্ব ছেড়েছেন কিছুদিন হল। বলেছিলেন নিজের ব্যাটিংয়ে বেশি করে মন দিতে চান। কিন্তু কোথায় ক্রিকেট? আগামী শনিবার ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচ। হাতে সাতদিনও নেই। কিন্তু প্রস্তুতি নয়, রাহুল দ্রাবিড়ের দিন কাটছে বিজ্ঞাপনের শুটিংয়ে। লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা—ব্যাট-বল সেখানে অবাঞ্ছিত। ১২ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব ছাড়ার কথা জানিয়েছেন। তারপর থেকেই বিজ্ঞাপন শুটিংয়ের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন মুম্বইয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। গত এক সপ্তাহে একটা-দুটো নয়, ৯টি বিজ্ঞাপনের শুটিং সেরেছেন 'মিঃ ডিপেন্ডেবল'। আর বিজ্ঞাপন নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে, কুড়ির বিশ্বকাপে ধোনি-বাহিনীর দুরন্ত লড়াই দেখার সময় বের করতে পারেননি!

রাহুলের মার্কেটিং এজেন্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি মিডিয়ার ম্যানেজিং ডিরে... লোকেশ শর্মাও স্বীকার করে নিলেন। অবশ্য যুক্তি দেখালেন, গত কয়েক ... অধিনায়ক হিসেবে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন শুটিংয়ের কাজ করতে পারেননি ...

কার্টুন : অবীক বসু

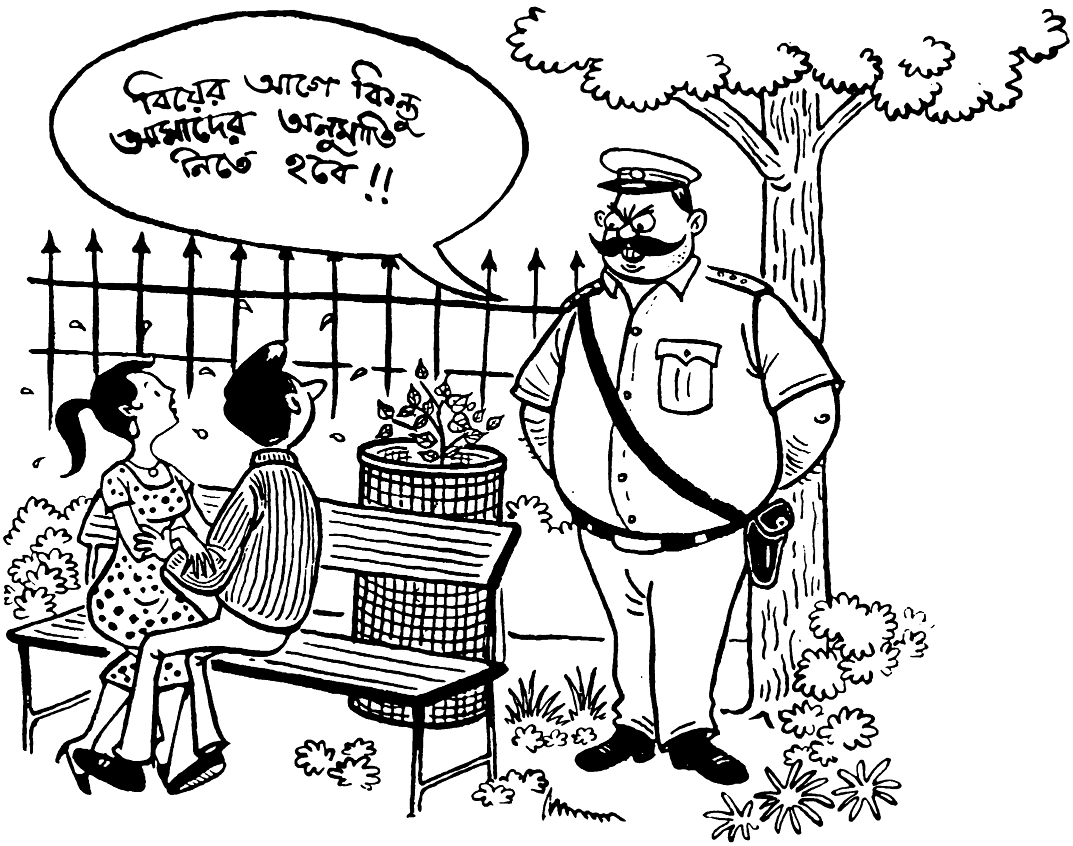

কার্টুন : ঋতুপর্ণ বসু